

এবং প্রান্তিক

সময়ের ক্ষতে সাহিত্যের প্রলেপ

An International Research Referred Journal

DIIF Approved Impact Factor : 1.12

Issue 1st Vol.4th September, 2014

সম্পাদক

আশিস রায়

E:\ebong prantik logo.tif

EBONG PRANTIK

Ebong Prantik

An International Research Referred Journal

Editorial Board

**Executive Editor**- Prof.Bratati Chakravarty.

**Editor-** Ashis Roy.

**Co-Editor**-Tumpa Bapari, Asish Kr.Sau, Sujay Sarkar.

**Expert Members**-

Dr.Alok Ranjan Dasgupta (Hedelberg University)

Dr.Achinta Chatterjee (California University)

Dr.Alokesh Dutta Roy (Scientist/Pharmaceuticals,Boston)

Dr.Manas Majumdar (Calcutta University)

Dr.Tarun Mukhopadhyay (Calcutta University)

Dr.Sambhunath Bandyopadhyay (Burdwan University)

Dr.Tania Hossain (Waseda University)

Dr.Soumitra Shekhar (Dhaka University)

Dr.Aloka Chatterjee (Banaras Hindu University)

Dr.Namita Bhattacharya (Banaras Hindu University)

Dr.Prakash Kumar Maiti (Banaras Hindu University)

Dr.Sumita Chatterjee (Banaras Hindu University)

Dr.Soumitra Basu (Rabindra Bharati University)

Dr.Srutinath Chakraborty (Vidyasagar University)

Dr.Samaresh Debnath (Dhaka University)

Dr.Bhuina Iqbal (Chattagram University)

Mr.Mrinmoy Paramanik (Research Scholar,Hydrabad University)

Mr.Md.Intaj Ali (Research Scholar,Hydrabad University)

মূল্য-২৫০ টাকা

সূচিপত্র

|  |  |
| --- | --- |
| রায় পরিবারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রঃ সুবিনয় রায় চৌধুরী/ব্রততী চক্রবর্তী | 1-6 |
| জাতীয়তাবোধ ও বাংলা নাটক/সৌমিত্র বসু | 7-13 |
| অতিপ্রাকৃত চিন্তা-চেতনার আলোকেঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি ছোটগল্প /নমিতা ভট্টাচার্য | 14-21 |
| সন্ত-সাহিত্য প্রসঙ্গ /সোমা দত্ত | 22-25 |
| মানব জীবনের আলেখ্যঃঘনরামের ‘শ্রীধর্মমঙ্গল’ /সুমিতা চট্টোপাধ্যায় | 26-37 |
| শামসুরের ‘আন্তিগোনে’ বিকীর্ণ পাঠ /ঋতম মুখোপাধ্যায় | 38-42 |
| ফুল ফুটুক না ফুটুক,কিন্তু যে কবিতা মানেই ‘আজ বসন্ত’ /আকাশ বিশ্বাস | 43-48 |
| চল্লিশের দশকের ভাঙ্গাগড়া ও বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিচ্ছবি/গৌতম মণ্ডল | 49-60 |
| যামিনী রায় এক ভুবন শিল্পী/আশীষ কুমার সাউ | 61-67 |
| বাংলা নাট্য আন্দোলনের সূচনা পর্বঃবিজন ভট্টাচার্যের আগুন,জবানবন্দী ও নবান্ন/পূর্বাশা ওঝা | 68-85 |
| বাউল সাধনাই বাউলদের জীবনাদর্শ/জয়ন্ত মণ্ডল | 86-93 |
| জীবনানন্দ দাশের বোধঃ মানসিক স্বপ্ন ভঙ্গের কবিতা/অমিত ধাড়া | 94-100 |
| বর্তমানে কেরীচারণা/শারদীয়া ভট্টাচার্য | 101-107 |
| ‘চেনা অচেনা পথ চলায়’: ভাবনা ও নতুন চেতনার সমন্বয়/শ্রীতম মজুমদার | 108-112 |
| রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতি চেতনা /দোলন মুখার্জী | 113-121 |
| দিগিন্দ্রচন্দ্রের ‘অপচয়’নাটকে দুঃখের মধ্যেও বাঁচার আকুতি/আশিস রায় | 122-126 |
| প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘সাগর থেকে ফেরা’: একটি মানবিক আবেদন/তন্ময় মণ্ডল | 127-134 |
| তুলসী লাহিড়ীর ‘বাংলার মাটি’: এক ভাঙ্গা মনের কাহিনি/টুম্পা ব্যাপারী | 135-138 |
| মৈমনসিংহ-গীতিকাঃ নায়িকার বারমাস্যা/মনোজিৎ রায় | 139-146 |
| দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে শ্রমিক শ্রেণি /আশিস রায় | 147-154 |

সম্পাদকীয়

কোন কোন সময় ভাবনার অলিন্দে বসে নতুন নতুন কিছু ভাবতে ইচ্ছা করে। এ নেশা শুধু যে আমার আছে এ দাবি করি না। সবার মধ্যেই অল্পসল্প বর্তমান। যখন দেখি যে সায়েন্স গ্রুপের পত্রিকায় Impact factor বসানো কোন সমস্যা নয়, যত সমস্যা এসে দাঁড়ায় Language group এর ক্ষেত্রে। এটা আমি মেনে নিতে পারিনি। আশাকরি আপনারাও মেনে নিতে পারবেন না। অনেক গুলো সংস্থার সাথে যোগাযোগ করি,সকলেই বলেছিলেন ভেবে দেখবেন।শেষ পর্যন্ত আমরা যারা Language group এর পত্রিকা করি তাদের কাছে খুশির খবর এটাই আমরা প্রত্যেকেই এবার থেকে আমাদের পত্রিকার Impact factor কত তা জানবার সুযোগ পাবো।

DIIF সংস্থাকে ‘এবং প্রান্তিক’ এর সকলের তরফ থেকে ধন্যবাদ। তিনি এই কাজটির জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং আমার কথা রেখেছেন। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের পাঠকদের কেননা তারা পত্রিকাটি সাদরে গ্রহণ না করলে আমদের পত্রিকার Impact factor : 1.12 কখনই হতো না।

রায় পরিবারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রঃ সুবিনয় রায়চৌধুরী

ব্রততী চক্রবর্ত্তী

সুবিনয় রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র, চতুর্থ সন্তান। জীবৎকালে শিশুসাহিত্যিকরূপে ইনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন, যদিও এখন তিনি বিস্মৃতপ্রায়। তাঁর জন্ম হয়েছিল কলকাতায়, ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর ডাক নাম ছিল মণি। তিনি সুদর্শন ছিলেন। পুণ্যলতা লিখেছেন –‘মণি ছিল ধবধবে ফর্সা, নীল চোখ , মাথাভরা চুল’। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ললিতকলা সম্পর্কে বাল্যকালেই সুবিনয়ের আগ্রহ জন্মেছিল। বিশেষতঃ গান, আবৃত্তি ও অভিনয়ের শখ ছিল তাঁর। ফটো তোলা ও ছবি আঁকার প্রবণতাও ছিল। বাল্যকাল থেকেই তিনি সৌখিন, সুরুচিশীল মানুষ ছিলেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে ঝোঁক ছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তরুণ সুবিনয় দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হন। এ সময় তিনি বিদেশী সৌখিন বস্তু পরিত্যাগ করে দেশী জিনিষ ব্যবহার করায় মন দেন। পুণ্যলতা লিখেছেন—“আমরা সমস্ত সৌখিন বিদেশী জিনিষ ছেড়ে দিয়ে মোটা দেশী জিনিষ ব্যবহার করতে আরম্ভ করলাম। আমাদের মধ্যে মণিরই উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশী’’। বিজ্ঞানে স্নাতক হবার পর, সুবিনয়ের বিবাহ হয় মধ্যপ্রদেশের চাঁদা শহরের ডাক্তার লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা পুষ্পলতার সঙ্গে, ১৯১৫ সালের প্রথম দিকে। উপেন্দ্রকিশোর তখন জীবিত ছিলেন।

সুকুমারের মতো সুবিনয়ও পিতার ব্যবসা দেখাশোনা করতেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে তিনি অধ্যয়ন করতেন। ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় তিনি ছোটদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও লিখতেন। সুকুমারের অকাল-মৃত্যুর পর (১৯২৩) ‘সন্দেশ’ সম্পদনার দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ে। সুবিমল গুণী মানুষ ছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত চক্ষুলজ্জা ও ভদ্রতাবোধের জন্য তাঁদের পারিবারিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটিকে সুবিনয় বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। শোনা যায়, পাওনাদারদের তিনি টাকা দিতেন, কিন্তু নিজের পাওনা তিনি উদ্ধার করতে পারতেন না। ফলে তিনি দ্রুত আর্থিক সংকটে পড়েন। ক্রমে পাওনাদারেরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ করেন। ১৯২৭ সালে ইউ রায় অ্যান্ড সন্স দেউলিয়া ঘোষিত হয়। বাড়ী, প্রেস, আসবাবপত্রাদি বিক্রি হয়ে যায়। উপেন্দ্রকিশোরের বিধবা স্ত্রী বিধুমুখী, সুকুমারের বিধবা স্ত্রী সুপ্রভা ও তাঁর শিশুপুত্র সত্যজিৎ, কুলদারঞ্জন রায়, সুবিমল রায় তাঁদের ১০০ নং গড়পার রোডের বাড়ী ছেড়ে আত্মীয় স্বজনদের গৃহে আশ্রয় নেন। সুবিনয়ের স্ত্রী পুষ্পলতা পুত্র সরলকুমারকে নিয়ে পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৩৬-৩৭ বছর বয়সে সুবিনয়কে আবার নতুন করে জীবিকার সন্ধান করতে হয়। পরে জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায় একটি পত্রিকা সম্পদনা করার চাকরী পেয়ে, সুবিনয় কলকাতায় একটি ছোট ফ্ল্যাটে স্ত্রী পুত্র নিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

সুবিনয় নিজে ছিলেন গুণগ্রাহী আর তাঁর গুণের সঙ্গেও অনেকে পরিচিত ছিলেন। তাই ইউ রায় অ্যান্ড সন্স-এর নতুন স্বত্বাধিকারী সুধাবিন্দু বিশ্বাস তাঁকে পুনরায় ‘সন্দেশ’ সম্পদনা করার জন্য অনুরোধ জানান। সুবিনয় সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। কয়েক বছর (১৩৩৮-১৩৪২) তাঁর সম্পদনায় পুনরায় ‘সন্দেশ’ প্রকাশিত হয়। সে যুগে দেব সাহিত্য কুটীরের বার্ষিক শিশুসাহিত্য সংকলন গ্রন্থ বিভিন্ন গুণী সাহিত্যিকরা সম্পাদনা করতেন। কর্তৃপক্ষের অনুরোধ সুবিনয়ও একবার সম্পাদনা করেছিলেন। সংকলন গ্রন্থটির নাম ‘আজব বই’ (১৯৩৬)। লীলা মজুমদার সুবিনয় সম্পর্কে লিখেছেন—“রামধনুর সম্পাদক সেদিন বলছিলেন, ঐ মানুষটির কাছে যে আমি কতভাবে ঋণী তা আর কি বলব। সম্পাদনার কোনো সমস্যা হলেই ওঁর কাছে ছুটে যেতাম। কখনও কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না’’।

সুবিনয় রায়চৌধুরীর লেখা বই সংখ্যায় পাঁচটি-‘খেয়াল’ (১৯৩৪), ‘জীবজগতের আজব কথা’ (১৯৩৮), ‘বল তো?’ (১৯৩৯), ‘কাড়াকাড়ি’ (১৯৩৯) ও ‘রকমারি’ (১৯৩৯) । এ বইগুলি ছাড়া সুবিনয়ের আরোও অনেক রচনা বিভিন্ন শিশুসাময়িকী ও সাহিত্য-সংকলন গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। সন্দেশ ছাড়াও শিশুসাথী, যাত্রী, কৈশোরক ইত্যাদি শিশু সাময়িকীগুলিতে তিনি লিখতেন। সে যুগে দেব-সাহিত্য কুটীর থেকে প্রকাশিত বার্ষিক সাহিত্য সংকলন গ্রন্থ ‘মায়ামুকুর’ (১৯৪০), ‘মধুমেলা’ (১৯৪২), ‘সোনালী ফসল’ (১৯৪২), রূপরেখা (১৯৪৩) ইত্যাদিতে তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

ছোটদের জন্য সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সুবিনয়কে জগদানন্দ রায়ের (১৮৬৯-১৯৩৩) উত্তরসূরী বলা যেতে পারে। তিনিও দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা বাংলার শিশুকিশোরদের জন্য পরিবেশন করেছেন। বিজ্ঞানের নব আবিষ্কৃত তথ্যাদি সম্পর্কে সুবিনয়ের গভীর আগ্রহ ছিল। তাঁর প্রবন্ধে বিজ্ঞান প্রীতি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সাহিত্যবোধের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার নানাজাতীয় তথ্য তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে অত্যন্ত সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য ভাষায় পরিবেশন করেছেন। জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উন্নতির কথা সুবিনয় বিশেষ ভাবে লিখেছেন। এ ছাড়া দ্রুতগতি যানবাহনের ক্রমউন্নতির ইতিহাস, নানাজাতীয় যন্ত্র আবিষ্কারের কথা, বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবর্জনা ও অন্যান্য বস্তু থেকে নতুন নতুন বস্তুর জন্মের কথা, ফটোগ্রাফির কৌশলের কথা, বিজ্ঞানভিত্তিক ম্যাজিকের খেলা, আদিম যুগের ছবি ও বর্তমানের উন্নত চিত্র-মুদ্রণের কথা অর্থাৎ এক কথায় নানান ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানব-সভ্যতার ক্রম -বিকাশের ইতিকথা তিনি মনোরম ভঙ্গিতে জানিয়েছেন।

সুবিনয়ের অধিকাংশ প্রবন্ধ এখনও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। ‘আজব বই’ ও ‘রকমারি’ গ্রন্থদুটিতে কয়েকটি মাত্র সংকলিত আছে। তাঁর অসংকলিত রচনার সংখ্যা শতাধিক। এগুলির মধ্যে ‘সন্দেশে’ প্রকাশিত কলের মুটে মজুর (ভাদ্র -১৩২৮), প্রজাপতির আত্মরক্ষা (আশ্বিন -১৩২৮), গরিলার সন্ধানে (অগ্রহায়ণ -১৩২৯), উপকারী পোকা (পৌষ -১৩২৯), আমাদের পূর্বপুরুষ (পৌষ -১৩২৯), আবর্জনায় ফলে সোনা (আষাঢ় -১৩৩০), আকাশে ওড়া (আশ্বিন -১৩৩০), রেলগাড়ির কথা (বৈশাখ -১৩৩১), প্রকৃতির খেলাধূলা (আশ্বিন-কার্তিক ১৩৩১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা। কৈশোরক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ‘আদিম থেকে আধুনিক’ (অগ্রহায়ণ -১৩৪৭ ও আশ্বিন -১৩৪৯) বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

প্রাণিতত্ত্বমূলক রচনা লেখার দিকে সুবিনয়ের বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিছু বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ছাড়াও এ বিষয়ে তিনি একটি সম্পূর্ণ বই লিখেছিলেন ‘জীবজগতের আজব কথা’ (ফাল্গুণ -১৩৪৫) নামে। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন—“বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞানের নিত্য নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্ছে, জীবজগৎ সম্বন্ধে নিত্যনতুন জ্ঞানলাভ হচ্ছে। এই পুস্তকে সেই সকল আজব কথার সামান্য কয়েকটি মাত্র লেখা হয়েছে। বলাবাহুল্য বিংশ শতাব্দীর আজব কান্ড ফটোগ্রাফি এই ব্যাপারে প্রধান সহায়’’। ‘জীবজগতের আজব কথা’ বইয়ে বারটি রচনা আছে – হাসির পাল্লা, পশুর বাজার, পোষাকের বাহার, অবাক কাণ্ড, শিম্পাঞ্জীভায়ার চিঠি, পশুপাখির ছবি, মানুষের খাতিরে, জীবজগতের নিয়মভঙ্গ, আজব বটে, নির্জীব জীব, পশুপাখির ভাষা ও চিড়িয়াখানার পলাতক নামে। ‘হাসির পাল্লা’য় লেখক বিভিন্ন পশুপাখির ‘হাসিমুখে’র বহু ছবি দিয়েছেন। ‘পশুর বাজার’ –এ লেখক বিভিন্ন পশুর বাজার দর, পশুদের স্বভাব, খাদ্য, দুষ্প্রাপ্য পশু ইত্যাদি বিষয়ে বিবরণ দিয়েছেন। বইটির সবচেয়ে উপভোগ্য রচনা ‘শিম্পাঞ্জীভায়ার চিঠি’। এখানে পোষা শিম্পাঞ্জীর নানান ক্রিয়াকলাপের ছবি আছে।

সুবিনয় রায়ের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাই তাঁর লেখা গল্পগুলিতে। ‘খেয়াল’, ‘রকমারি’, ‘কাড়াকাড়ি’, এই তিনটি বইয়ে তাঁর অনেকগুলি গল্প সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া ‘সন্দেশ’ ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর বহু গল্প ছড়িয়ে আছে। সুবিনয়ের লেখা গল্পগুলির কিছু কৌতুক-কাহিনি, কিছু রূপকথা-উপকথামূলক, কয়েকটি প্রচ্ছন্ন শিক্ষামূলক। তাঁর গল্প বলার কৃতিত্ব সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে ‘সন্দেশে’র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত ‘গপ্পিদাসের গল্প’ গুলিতে। গপ্পিদাসের গল্পের বক্তা হলেন আজগুবিপুরের রাজা গপ্পিদাস। রাজা গপ্পিদাস (বৈশাখ-১৩২৯), গপ্পিদাসের গল্প ( জৈষ্ঠ্য -১৩২৯), গপ্পিদাসের খুড়ো (আষাঢ়- ১৩২৯) এবং গপ্পিদাসের ঘোড়া (আশ্বিন- ১৩২৯) এই চারটি শিরোনামে গপ্পিদাসের জীবনের দশটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, সুবিনয় গপ্পিদাসের গল্প লিখতে গিয়ে সম্ভবতঃ Rudolph Erich Rapse-এর লেখা The Adventures of Baron Munchhausen গ্রন্থটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন।

‘সন্দেশ’এ প্রকাশিত সুবিনয়ের লেখা আংটির গুণ (মাঘ-ফাল্গুণ- ১৩২৭), চালাক শিয়াল ( আষাঢ় -১৩২৮), বুদ্ধিমান রাজকুমার (কার্তিক-১৩২৮), সজারুর পিঠে কাঁটা কেন? (মাঘ- ১৩২৯), খুঁতখুঁতে হাঁস (শ্রাবণ- ১৩৩০) ইত্যাদি গল্পগুলি রূপকথা-উপকথা জাতীয়। তাঁর ডেং-মো-চি ও নাম চুরি গল্প দুটি জাপানি উপকথা অবলম্বনে লেখা। সরসতা, সরলতা, অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গি ও কৌতূহলোদ্দীপকতা এ সব গল্পের বৈশিষ্ট্য। রায় পরিবারের শিশুসাহিত্যিকদের সমগ্র রচনাগুচ্ছে যে একটি পারিবারিক সাদৃশ্য দেখা যায়, সেই সহজ ভঙ্গি “গল্প বলার অবসাদহীন প্রবাহ, কণ্ঠস্বরের সেই লাবণ্য” বুদ্ধদেব বসু যাকে বলেছেন ‘সাহিত্য রান্নার লবণ’, সেই গুণটি সুবিনয়ের উপকথা জাতীয় গল্পগুলিতে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়।

সুবিনয় কিছু কবিতাও লিখেছিলেন। ‘আজব বই’ ও ‘কাড়াকাড়ি’ বইয়ে তিনটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। ‘আজব বই’য়ের প্রারম্ভে একটি সূচক কবিতা হিসাবে পাই ‘আজব’ নামের কবিতাটি।‘কাড়াকাড়ি’ বইয়ের কবিতা দুটির নাম ‘সিঙ্গিমামার কাণ্ড’ ও ‘গলাসাধা’। এছাড়া ‘সন্দেশে’ প্রকাশিত গ্রীষ্ম ও বর্ষা (শ্রাবণ ১৩২৮), ওস্তাদ (অগ্রহায়ণ ১৩২৮), বর্ষা ও ফর্সা (অগ্রহায়ণ ১৩২৯), ময়রার চোর ধরা (বৈশাখ-১৩৩১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবিতাগুলির কিছু কাহিনি মূলক, কিছু প্রকৃতি-ভিত্তিক। ‘বল তো’ লেখকের সংকলিত ধাঁধা ও হেঁয়ালির বই।

১৩৩০ সালের ২৪ শে ভাদ্র সুকুমারের মৃত্যুর পর ‘সন্দেশ’ সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়ে সুবিনয় রায়ের উপর। আশ্বিন ১৩৩০ থেকে কার্ত্তিক ১৩৩৩ সাল প্রর্যন্ত সুবিনয়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সুবিনয় সর্বদা তাঁর উপাধি রায়চৌধুরী লিখতেন। সুবিনয়ের সম্পাদনাকালে ‘সন্দেশে’র আর তেমন প্রতিপত্তি থাকল না। তিনি গুণী সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু পারিবারিক নানান দুর্যোগ ও আর্থিক কারণে এ সময় ‘সন্দেশে’র প্রকাশ নিয়মিত হয় নি। কখনও কখনও দু’মাসের ‘সন্দেশ’ এক সঙ্গে প্রকাশিত হোত।

‘সন্দেশে’র অঙ্গসৌষ্ঠব ও রচনার আদর্শ সুবিনয়ের সম্পাদনাকালে প্রায় আগের মতোই ছিল। তবে সুকুমারের সময়ে চিত্রের যে ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে, তা সুবিনয়ের –কালে স্বভাবতাই হ্রাস পেয়েছে। সুবিনয়ের সম্পাদনা কালে চিত্র প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হয়। বৈশাখ ১৩৩১ সংখ্যায় একটি প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করা হয়। জ্যোষ্ঠ ১৩৩১ সংখ্যা্র ‘সন্দেশ’ থেকে জানা যায় বিশেষ পুরস্কার (লজঞ্চুস) পেয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্প, কবিতা, নাটিকা, শিকারকাহিনি, প্রবন্ধ, ধাঁধা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি এ সময়েও ‘সন্দেশে’র শ্রীবৃদ্ধি করেছে। তবে সম্পাদক সুবিনয়ের বিশেষ ঝোঁক ছিল বিজ্ঞানের দিকে।

চরম আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে ১৩৩৩ সালের কার্তিক সংখ্যার পর ‘সন্দেশ’ বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকার স্বত্ব, প্রেস ইত্যাদি হস্তান্তরিত হয়ে যায়। নতুন স্বত্বাধিকারীর অনুরোধে পাঁচ বছর পর সুবিনয় পুনরায় ‘সন্দেশ’ সম্পাদনা করেছিলেন। ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাস থেকে দ্বিতীয় বার তাঁর সম্পাদনায় ‘সন্দেশ’ প্রকাশিত হয়। কিন্তু চার বছরের মধ্যেই ১৩৪২ সালে পত্রিকাটি পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়।

সুবিনয় শেষ জীবনে বহু শারীরিক কষ্ট ভোগ করেন। তাঁর ডায়াবিটিস ছিল, তার উপর তিনি যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। ডাক্তারি চিকিৎসায় যক্ষা নিরাময় হলেও, পরে তাঁর প্লুরিসি হয়। ফলে বহু কষ্ট পেয়ে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ শে জানুয়ারী সুবিনয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সূত্রনির্দেশঃ

১। ছেলেবেলার দিনগুলি, পৃ-১৬

২। পাকদণ্ডী, অমৃত, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৭।

৩। বাংলা শিশুসাহিত্য, সাহিত্যচর্চা, পৃ-৪৩।

৪। ভূমিকা, সেরা ‘সন্দেশ’ পৃ-৯।

জাতীয়তাবোধ ও বাংলা নাটক

সৌমিত্র বসু

আলোচনার শুরুতেই, নাটক নামক সংরূপের দু-একটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে বলব। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, কোন কোন ব্যতিক্রম ছাড়া, নাটক লেখা হয় অভিনীত হবার জন্যে, অর্থাৎ, এই সাহিত্য মাধ্যমটি আর পাঁচটা সাহিত্য মাধ্যমের মত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, সে একটি বড় ও মৌল পরিবর্তনের দায় নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়। এই বৈশিষ্ট্য সে পেয়েছে তার জন্ম সময় থেকেই, প্রাচীন বা মধ্যযুগে, যখন ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয় নি, যে কোনো সাহিত্যই ছিল পারফর্মেন্স বা উপস্থাপনা নির্ভর। উপস্থাপনায় যেহেতু হরফ নির্ভরতা সরে গিয়ে সাহিত্যের প্রকৃতি বদল হয়ে যায়, তাই একাকী পাঠকের থেকে সরে গিয়ে তখন সে পৌঁছতে চায় একই সঙ্গে অনেক উপভোক্তার কাছে। এই উপস্থাপনা নির্ভরতার কারণে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে সেলিম আল দীন বলতে চেয়েছেন নাট্য, তাঁর মতে, চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র, বাংলা সাহিত্যের যে বিপুল অংশটিকে ঐতিহাসিক কারণেই উপস্থাপনার ওপর নির্ভর করতে হত, তাদের নাট্য সাহিত্যের অন্তর্গতই করা উচিত।

ছাপাখানা এল, লিখিত রূপেই সাহিত্য পৌছে যেতে পারল বহু মানুষের কাছে, তখন, সেই যন্ত্রনির্ভরতার যুগে এসেও সাহিত্যের যে দুটি ধারা উপস্থাপনা নির্ভর হয়েই রইল, তাদের মধ্যে একটি হল নাটক, অন্যটি গান। পরে নাটক থেকে উপস্থাপনা নির্ভর আর একটি সাহিত্য মাধ্যম তৈরি হয়ে উঠবে, সে হল চিত্রনাট্য। সংরূপ বদলের আলোচনায় যাবার অবকাশ হবে না আমাদের, আমরা শুধু এই কথাটি বলে নিতে চাই যে, আলাদা আলাদা একক পাঠককে নয়, একই সঙ্গে বহু মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া তৈরির জন্যই রচিত হয় নাটক, তাই কোন সামূহিক ভাবনা প্রচার করবার জন্যে অনেক সময়েই এই সংরূপটির আশ্রয় নেওয়া হয়। মধ্যযুগের সব সাহিত্যকেই যখন হতে হত নাট্যলক্ষণাক্রান্ত, তখন তাকে দিয়েই ধর্ম প্রচারের কাজ করতে চেয়েছে আমাদের সমাজ, ছাপাখানা আবিষ্কৃত হবার পরের যুগেও, সামাজিক রাজনৈতিক নানা বিষয়ে প্রচারের কাজ করবার জন্যে সেই নাটকেরই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি করে। সেই সূত্রেই, নাটক যে অন্য যে কোন সাহিত্য মাধ্যমের তুলনায় জাতীয়তাবোধ প্রচারের বড় হাতিয়ার হয়ে উঠবে তা তো স্বতঃসিদ্ধ।

ইতিহাসের সেই পর্বে প্রবেশ করার আগে দেখে নেওয়া যাক, জাতীয়তাবোধ বলতে কী বোঝায়। David Jary & Juliya Jari রচিত Dictionary of Sociology গ্রন্থে Nationalism –এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে, the belief in, and feeling of belonging to, a people united by common historical, linguistic and perhaps ‘racical’ or religious ties, where this people is identified with a particular territory and other constitutes a NATION STATE or his aspirations to do so. জাতীয়তাবাদের এই ধারণা দুভাবে কাজ করতে পারে। আগ্রাসনের অস্ত্র হিসেবে যেমন সে তৈরি করতে চেয়েছে ইহুদি খেদানো আর্যদের পৃথিবী অথবা প্রাচীন রোমান বা হিন্দু সভ্যতার মহিমা প্রচার করতে, আবার এর উল্টোদিকে পরাধীন কোন দেশ এই জাতীয়তার আবেগে চাইতে পারে স্বাধীনতা, সে আবেগে মৃত্যুকেও তুচ্ছ করার যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বস্তুত, জাতীয়তাবোধ হল এমন এক ধারনা, যা সর্বমানবতার ধারনা থেকে মানুষকে সরিয়ে আনতে পারে গোষ্ঠীপ্রেমে, জন্ম দিতে পারে প্রাদেশিকতা বা সাম্রাজ্যবাদের। Because religion seeks to give meaning and direction to the place and purpose of our existence in the world, it is thus bound up with all the circles of human interaction from the most minimal, such as family, to the broadest-humanity, and even Creation as a whole. These circles make up our identity, not only as individuals but also as social beings. From family though congregations, communities, ethnic groups, nations, to international frameworks, these are the building blocks of our multi-faceted identities and we ignore these components at our peril. (Nationalism and Fundamentalism in Modern Society Focus on Israel by Rabbi David Rosen) যদি ইংরেজ আর ভারতবাসী এই দুটি জাতিকে পরস্পর যুযুধান বলে ভাবি, তাহলে মেনে না নিয়ে উপায় নেই, নিজেদের যে জাতীয়তাবাদের ধারনা থেকে ইংরেজ আমাদের অবজ্ঞা করেছে, সেখান থেকেই আমাদের সাহিত্যে, নাটকে জাতীয়তাবোধের প্রকাশ। বলা বাহুল্য, পরাধীন জাতির জাতীয়তাবোধ প্রকাশিত হতে চেয়েছিল প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে। সে প্রতিবাদ কখনো এসেছে রঙ্গব্যঙ্গের পথ ধরে, কখনো সমকালীন সমাজের চেহারা তুলে ধরা হয়েছে, কখনো আবার সে আশ্রয় করেছে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আখ্যানকে। এই বিপুল বিস্তারকে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে না, তবে আলোচনা শুরু করবার আগে প্রতিবাদী নাটকের গঠন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্যকে আমরা সামনে রাখতে চাইবো। The drama of attack: didactic plays of the American depression নামের গবেষণা গ্রন্থে Sam Smiley বলেছেন, “An author usually arranges a mimeetic play in acts, scenes, segments and beats (paragraphs of dialogue.). Although a didactic dramatist may use those terms, the disposition of most didactic plays more closely corresponds to the quantitative arrangements of a speech—exordium, argument, proof and peroration. বাংলা জাতীয়তাবাদী নাটকের গঠনশৈলী লক্ষ করলে এই প্রবণতা নিশ্চিতভাবেই চোখে পড়বে।

উনিশ শতকের মধ্যপর্ব থেকেই বাংলা নাটকে জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে ঘটে গেছে সিপাহি বিদ্রোহ। বাঙালি ভদ্রলোকেরা সে বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি বটে, বিরোধিতাই করেছিলেন, কিন্তু তারপরে পরেই দীনবন্ধু বা উপেন্দ্রনাথ দাসদের আগমন বুঝিয়ে দেয়, সিপাহিদের দলে না গিয়েও বাঙালি বুদ্ধিজীবীর একটা অংশের মনে ইংরেজদের সম্পর্কে বিদ্বেষ তৈরি হয়েছিল, তাঁদের মধ্য নাটকের মানুষ যাঁরা তাঁরা স্বভাবতই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নাটককে ব্যবহার করতে চাইছেন। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক নানা দিক থেকেই বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলার গ্রাম, সেই গ্রামের নিপীড়িত চাষী এবং ভূস্বামীর জীবন্ত ছবি চলে এল তাঁর এই নাটকে, এবং তার সূত্র ধরে রচিত হতে থাকল আরো বেশ কিছু দর্পণ নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বা রাজকৃষ্ণ রায়ের মত কেউ কেউ লিখেছেন ঐতিহাসিক নাটক, যার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের প্রচ্ছদে ব্রিটিশ বিরোধিতার কথা বলা হচ্ছে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, আখ্যানগুলি নেওয়া হচ্ছে মূলত রাজপুতদের সঙ্গে মুঘলদের যুদ্ধ থেকে। ফলে, অনিবার্যভাবে সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপিত হচ্ছে। হিন্দু নাটককারেরা স্বাধীনতাস্পৃহা থেকে যে নাটক লিখেছেন, তাঁদের জ্ঞাতসারে অথবা অবচেতন বিশ্বাস থেকে তা কখনো তৈরি করে ফেলছে মুসলমান বিরোধিতার মনোভাব। উনিশ শতকের প্রধান নাট্যজন গিরিশচন্দ্রের মধ্যে যে সেই মনোভাব ছিল তা বুঝতে পারা যায় যখন তিনি ‘অশ্রুমতী’ নাটকে অভিনয় করতে অস্বীকার করেন, কারণ সেখানে মুসলমান সেলিমের সঙ্গে হিন্দু অশ্রুমতীর প্রণয় দেখানো হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ দাসের লেখায় এতটাই তীব্রভাবে সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধিতা চলে আসছে যে ইংরেজ সরকারকে নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল আনতে হল, যার প্রতিক্রিয়ায় বাংলা থিয়েটার তার বিদ্রোহ প্রবণতাকে সংবরণ করে উনিশ শতকের শেষ পর্বে ভক্তি নয়তো রঙ্গরসে মেতে উঠল। থিয়েটারের এও এক সীমাবদ্ধতার দিক, বিশেষ করে পেশাদার থিয়েটারের। লিখিত সাহিত্যের মত সে ইচ্ছে করলে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে না, একটি নির্দিষ্ট থিয়েটারবাড়িতে চুক্তিমত নির্দিষ্ট দিনে ঘোষণা করে অভিনয় করবার জন্যে হাজির হতে হয় যাদের, রাজরোষের হাত এড়িয়ে তারা পালাবেন কেমন করে?

আগুন কিন্তু জ্বলছিল। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় কংগ্রেস। শিশিরকুমার দাশ তাঁর অসামান্য গবেষণাগ্রন্থ The History of Indian Literature- এ ১৮৮৫ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পটভূমিতে কী কী বৈশিষ্ট্য তৈরি হচ্ছে তার সূত্রগুলি দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে যেগুলি আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক সেগুলিকে সামনে রাখা যাক—

1885-1910

1. The growth of political consciousness and nationalism and its relation with the.
2. Literature of this period.
3. Reinterpretation of our past heritage and creation of new heroes of our history and legends.
4. Introduction of fresh themes exploring various dimensions of man- woman relationship.
5. Contemporary socio religious movements and their impact on literature.
6. Continuous tension between the forces of revivalism and those of modernization.

এই তালিকার প্রথম দুটি সূত্রকে বলতে পারি বিষয় নির্ভর, অর্থাৎ জাতীয়তাবোধের ধারনা ছড়িয়ে পড়ার পথ ধরে কেমন করে আমাদের পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক আখ্যানগুলির পুনর্নির্মাণ ঘটছে তার আন্দাজ পাওয়া যাবে এর মধ্যে। শেষ সূত্রটি প্রাসঙ্গিক তার কারণ উনিশ শতকের শেষ পর্বে যে সামাজিক এবং ধর্মীয় আন্দোলনগুলো শুরু হচ্ছে, স্বভাবে যাই হোক, তাদের উদ্ভবের একটি কারণ যে জাতীয়তাবোধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তৃতীয় সূত্র বলছে কেমন করে দেশজ প্রযোজনারীতি মিশে যাচ্ছে বিদেশী থিয়েটার ভাবনার সঙ্গে। শিশিরকুমারের লেখায় নারী পুরুষ সম্পর্কের নতুন তাৎপর্য তৈরি হওয়ার কথা আছে। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জাতীয়তাবোধ প্রত্যক্ষ সংযোগ হয়তো নেই, কিন্তু দেশাত্মবোধের উন্মেষ যে নারী পুরুষ সম্পর্কের ধারণাকে বদলে দিয়েছে তার উদাহরণ আমাদের একাধিক নাটকে পাবো।

পেশাদার থিয়টারে জাতীয়তাবোধের প্রকাশ যে কেবলমাত্র আদর্শবাদ থেকে এসেছিল এমনটা ভাবলে ভুল হবে। বস্তুত, তখনকার পেশাদার থিয়েটারে প্রচুর দর্শক আসতেন এমনটা ভাবার কারণ নেই, তাঁদের সংখ্যার স্বল্পতার জন্যেই বারবার নাটক পালটাতে হত। উনিশ শতকের শেষের দিকে যে প্রচুর ভক্তিমূলক নাটক প্রযোজিত হচ্ছিল তার একটি কারণ যেমন আগেই উল্লিখিত নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল, তার সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব অথবা বিবেকানন্দের আমেরিকা জয়ের কথাও মনে রাখতে হবে। তার ওপরে, নানা রাজনৈতিক ঘটনার চাপে বাঙ্গালির মন ইংরেজের প্রতি বিমুখ হয়েছিল, নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্যকেই তারা আঁকড়ে ধরতে চাইল, তার প্রতিফলন এসে পড়ল থিয়েটারে। ঠিক তেমনি করে, বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা আমাদের অস্তিত্বের গোড়া ধরে টান মারল, দেশাত্মবোধে বাঙালি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। সেই আবেগকে বক্স অফিসের কাজে লাগানোর ভাবনাও এঁদের ছিল না এমন নয়।

বিশ শতকের গোড়া থেকেই নানা ধরণের রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হচ্ছিল। হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ভেদ তৈরির জন্য একদিকে পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা, আর অন্যদিকে পূর্ব বঙ্গ আর আসামকে রেখে ভাগ করার পরিকল্পনা হল। এই উদ্যোগ সফল হয়েছিল, এর ফলে ভারতীয় মুসলিম লীগ আর ভারতীয় হিন্দু মহাসভা তৈরি হল। এ সব কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নাটক যে কখনও সমকালকে বেছে নেয় নি এমন নয়। যেমন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের যুবরাজের আগমন উপলক্ষে লিখেছিলেন এসো যুবরাজ, বছর না পালটাতেই তিনি লিখলেন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ (১৯০৫) নামে নাটক। কিন্তু মূলত লেখা হয়েছে ঐতিহাসিক নাটক—যেমন গিরিশচন্দ্র লিখছেন সিরাজদৌল্লা (১৯০৬), মীরকাশিম (১৯০৬), ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭), হরনাথ বসু লিখছেন জাগরণ (১৯০৫) অতুলকৃষ্ণ মিত্র-বাপ্পারাও (১৯০৫) মনোমোহন গোস্বামী- পৃথবিরাজ (১৯০৫) বা পলাশীর প্রায়শ্চিত্য রচনা করছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৯০৭)। নাটক লিখতে গিয়ে ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়ার একটি বড় কারণ নিশ্চয় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের ভয়, কিন্তু তার বাইরেও, জাতির এই সংকটকে এঁরা দেখতে চাইছেন বড় প্রেক্ষিতে, তাকে দিতে চাইছেন আবহমানতার গরিমা। এই সময়ের নাটককারেরা ইতিহাসের মধ্যে থেকে কোনো জাতীয় বীরকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছেন, সেই বীরের নামেই দেওয়া হচ্ছে নাটকের নাম। আর ইতিহাস, এবং কিছুটা পরিমাণে পুরাণের ব্যবহার কোথাও এই নাটককারদের, এবং সেই সঙ্গে দর্শকের আপন ঐতিহ্যের প্রতি ভালবাসার চিহ্নও বহন করে। তবে মনে রাখতে হবে, এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা সব সময় ইতিহাসের তোয়াক্কাও করছেন না। যেমন, সিরাজদৌল্লাকে নায়ক বানাতে গিয়ে তাঁকে যে মহিমা দেওয়া হচ্ছে তা হয়তো ইতিহাস সম্মত নয়। এই পর্বের খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এক নাটককার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনিও মূলত ঐতিহাসিক নাটকের রচয়িতা, রঙ্গব্যঙ্গেরও বটে। ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করে দিতে চাইছেন। গিরিশচন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশি পরিশীলিত মনে হয় তাঁকে, অনেক বেশি নাগরিক। বস্তুত, গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালকে দিয়ে বাংলা জাতীয়তাবাদী নাটক লেখার একটি পর্ব শেষ হল। বিশের দশক থেকে উঠে আসছেন নবীন নাটককারেরা, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, বা যোগেশ চৌধুরী—যাঁরা প্রাচীন ধারার অনুবর্তী ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়দের সরিয়ে জায়গা করে নিচ্ছেন। তাঁদের লেখায় নতুন স্বাদ কিছুটা এল বটে, কিন্তু এটা মানতেই হবে, বিষয় এবং ঘরানার দিক থেকে তাঁরা পূর্বসূরিদেরই অনুসরণ করেছেন, ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, একেবারে প্রথম নাটক রুদ্রচন্ড থেকেই এই মানুষটি প্রচলিত নাট্যগঠনের ছাঁদকে অগ্রাহ্য করেছেন, বিষয়ের দিক থেকেও নতুন পথে যেতে চেয়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক পটভূমি বিষয়ে এই মানুষটির প্রত্যক্ষ ধারণা তাঁর সমকালীন অন্য যে কোন নাটককারের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, আর যেহেতু পেশাদার থিয়েটারের জন্য কলম ধরেন নি, তাই সেই জ্ঞানকে নিজের মত করে প্রয়োগ করার স্বাধীনতাও তাঁর ছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকে খুবই পরিশীলিত ভঙ্গিতে একটি দেশজ বাকভঙ্গি চলে আসে, এমন কি রক্তকরবীর মত আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে লেখা নাটকেও। তাঁর জাতীয়তাবোধের প্রকাশ মুখ্যত নাটকের শৈলীতে, ইউরোপীয় ঘরানাকে মাথায় রেখেও তাকে অগ্রাহ্য করার স্পর্ধায়, আর রাজা ও রাণী থেকে তপতী বা গান্ধারীর আবেদনের মত নাটকে স্বাধীনতা স্পৃহা ছদ্মবেশে চলে এসেছে।

সেই ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য দরকার ছিল তীব্র কোনো অভিঘাত, যা আসবে নাট্যশালার বাইরে থেকে। চারের দশক তেমনই অভিঘাত নিয়ে এল। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের সেই বিখ্যাত মন্তব্য মনে পড়বে আমাদের, বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে বিশ্বমানবের চরিত্র পালটাতে শুরু করে ( on or about December 1910 human character changed.)। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বিশের দশকের পূর্বাহ্নেই ফ্যাসিবাদের উত্থান, উঠে আসছেন হিটলার। আমাদের দেশে নানা ধরনের রাজনৈতিক পালাবদল চলছে। যন্ত্রসভ্যতার প্রভূত উন্নতি হয়েছে, গোটা বিশ্বের খবর আগের চেয়ে অনেক সহজে পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের কাছে। আবিশ্ব এই পরিবর্তন বাংলা পেশাদার থিয়েটারের জগৎকে যে খুব প্রভাবিত করতে পেরেছিল এমন নয়, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ধারাগুলির তুলনায় সে অনেক বেশি প্রথাজীবী হয়েই বেঁচে ছিল। এমন কি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মত মানুষও তাকে মূল প্রবণতা থেকে নড়াতে পারেন নি। তার অন্যতম প্রধান কারণ, পেশাদার থিয়েটারকে শিল্প সৃষ্টি করতে হয় আম জনতার জন্যে, তাদের তাৎক্ষনিক তুষ্টির দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয় তাঁদের। বিশ্বমানবের যে উপরিতলার অংশের চেতনা পালটাচ্ছিল, আমাদের দেশের সাধারণ দর্শকের চেতনার অবস্থান তার থেকে বহু দূরে। সে অবস্থানে ধাক্কা লাগল চারের দশকে এসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হয় দূরের ঘটনা, কিন্তু জাপান বোমার ভয়, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগে রক্তাক্ত স্বাধীনতা, যার পথ ধরে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ঢল অন্য রকম এক জাতীয়তাবোধের জন্ম দিচ্ছিল, যা নিষিক্ত হয়ে উঠছিল কম্যুনিস্ট মতাদর্শে। আলাদা একটা নাট্যধারা তৈরি হল, পেশাদার থিয়েটারের বাধ্যতাকে যে অগ্রাহ্য করতে পারে। বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ীদের হাতে বদলে গেল বাংলা থিয়েটারে দেশাত্মবোধের ধারনা, আরো বেশি আঁকাড়া বাস্তবকে সামনে রেখে, আরো বেশি তীব্র মানবপ্রেম নিয়ে রচিত ও প্রযোজিত হতে লাগল নাটক।

এই ধারাতেও নানা পরিবর্তন আসবে, গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার, সেখান থেকে আজকের এই আদর্শবিহীন ভোগবাদী সমাজের সঙ্গে কেমন করে তাল মেলাতে চাইছে বাংলা নাটক, সেই আলোচনার দ্বারপ্রান্তে এসে এই বিবরণ শেষ করা যাক।

অতিপ্রাকৃত চিন্তা-চেতনার আলোকে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি ছোটগল্প

নমিতা ভট্টাচার্য

অজানার আনন্দে বিশ্বজগৎ ভরা। মানুষের সংকীর্ণ ইন্দ্রিয় শক্তির চারপাশ ঘিরে তার চোখের সামনে, তার অনুভব ও স্পর্শ শক্তির সামনে, তার মনের সামনে অনন্ত অসীম রহস্যময় অজানার মহাসাগর। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসা, পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে আর একটি জগৎ বিরাজিত যাকে অতিপ্রাকৃত জগৎ বলে অভিহিত করা যায়।

পৃথিবীর প্রায় সকল সাহিত্যেই অতিপ্রাকৃতের পরিচয় রয়েছে। অজানার প্রতি আকর্ষণ মানুষ অনুভব করেছে চিরকাল। ফলে জেগেছে কৌতূহল, আর এই কৌতূহল এক রহস্যের আবরণে ঘেরা অজানাকে জানবার জন্যে মানুষকে উৎসাহিত করছে বারং বার। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সম্পাদিত ‘বাংলা ভাষার ব্যাকরণ’ নামক গ্রন্থে অতিপ্রাকৃতের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ- “অতিপ্রাকৃত; অতি(অতিক্রমার্ধে) প্রাকৃত(প্রকৃতির ভাব) বিন, স্বভাবের অতিরিক্ত; অতি স্বাভাবিক; অনৈসর্গিক supernatural (সম-প্রাকৃত বা স্বাভাবিক নহে) যা প্রকৃতির ভিতর বা সাধারনের মধ্যে বা লোকে দেখা যায় না, যা অনৈসর্গিক বা অলৌকিক তা অপ্রাকৃত। যা প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, তাই অতিপ্রাকৃত। প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ বা অস্বাভাবিক হইলে অতিপ্রাকৃত Un-natural বা Non natural এবং প্রকৃতি যা নিয়মের বর্হিভূত বা বাইরে তা অতিপ্রাকৃত Supernatural.’’

ইংরেজি সাহিত্যে কলিস নিউ.এজ. ‘এনসাইক্লোপিডিয়া’ গ্রন্থে অতিপ্রাকৃত সম্বন্ধে বলেছেন-

Superstition- an irrational belief, half-belief, or practice. Those who use the term imply that they have certain knowledge or superior evidence for their own scientific, philosophical or religious conventions. But the World is ambiguous, and it seems likely that it cannot be used except subjectively with this qualification in mind. Superstitions may be classified roughly as religious, cultural and personal. (Encyclopedia Britannica, Vol. 21.1969, P.432)

অনুরূপে ‘বিশ্বকোষ’, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’, ‘বাংলা ভাষার অভিধান’, ‘চলন্তিকা’,‘বাংলা অভিধান’, (সংসদ) গ্রন্থেও অতিপ্রাকৃত শব্দটির কোন বিশিষ্ট ব্যাখ্যা নেই।

প্রকৃতির নিয়মে সমস্ত জিনিসেরই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ‘জন্মিলেই মরিতে হবে অমর কে কথা কবে’ -এ নিয়ম লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। তাই যখন মৃত্যু হয়, তখন আমাদের মনে এক রহস্যঘন রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। কেননা মৃত্যুর পর কি ঘটে তা জানবার উপায় নেই। আর নেই বলেই কৌতূহলী মানব মন জানতে চায় সে অজানাকে, তখনই অতিপ্রাকৃতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যা ছিল স্বাভাবিক, প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী, তাই যখন প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করে নয়, অতিক্রম করে যায়, তখনই হয় অতিপ্রাকৃত। রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি প্রকৃতির দেওয়া নিয়মগুলি যখন আর স্থূল ভাবে পালিত হয় না, তখনই অতিপ্রাকৃত ভাবনার রোমাঞ্চ মানব মনকে অধিকার করে।

মানুষের জীবনের প্রতিফলন হয় সাহিত্যে তাই স্বাভাবিক ভাবেই অতিপ্রাকৃতের প্রতিফলনও হয় সাহিত্যে। এই অতিপ্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সকলের মনের গভীরে একটা আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ আছে। আবার সেই আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ অনেকের মনে বিশ্বপ্রপঞ্চের সঙ্গে বিজড়িত, বিশ্ব জগতকে অতিক্রম করে আর সঙ্গে সঙ্গে তাতে অন্তর্নিহিত থেকে, বিদ্যমান আর কার্যকর এক ঐশী শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস বা আস্থার রূপ গ্রহণ করে থাকে। এই আস্থা বা বিশ্বাস, ভৌতিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক বা মানসিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়তো অসম্ভব কিন্তু উপলব্ধি আর অনুভূতির মাধ্যমে তা সহজ এবং প্রমাণিত সত্য বলেই প্রতিভাত হয়। আমার আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অভিশপ্ত’ গল্প দুটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনেক আধুনিক লেখক কিংবা তাঁর সমকালীন কোন কোন বিদেশী লেখক সংখ্যার দিক থেকে এবং প্রাচুর্যে অতিক্রম করেছেন। কিন্তু বিষয় বৈচিত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রায় অদ্বিতীয়। তাঁর গল্পের পটভূমি কখনও গ্রাম আবার কখনও শহর, আবার কখন তাঁর গল্পে প্রকৃতির শান্ত, সিগ্ধ কোমলতা, কখনও নির্মম উদাসীনতা। তাঁর কোনো গল্পে বর্তমান জীবনের পরিচিতি আবহাওয়া, কোন গল্পে সুদূর অতীতের রহস্যঘন আবরণ, আবার কোন গল্পে অতিপ্রাকৃতের শিহরণ। তবে রবীন্দ্রানাথের লেখা অতিপ্রাকৃতের পরিমন্ডল সৃষ্টিকারী গল্পের সংখ্যা খুবই কম।

১২৯৮ বঙ্গাব্দে –- ‘সম্পতি সমর্পণ’, ‘কঙ্কাল’

১৩০১ বঙ্গাব্দে –- ‘নিশীথে’

১৩০২ বঙ্গাব্দে—‘ক্ষুধিত পাষাণ’

১৩০৫ বঙ্গাব্দে – ‘মণিহারা’

বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ভগীরথ রবীন্দ্রনাথ ঠিক অতিপ্রাকৃত বিষয়কে কেন্দ্র করে কোন কিছু রচনা করেননি বলা চলে। তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পের (ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা, নিশীথে, কঙ্কাল, মাষ্টারমশাই) আধার হয়েছে বর্তমানের মনস্তাত্বিক পটভূমি।

সুদূর প্রসারী ও অন্তর্ভেদী কল্পনার বিচিত্র লীলায় মনস্তত্বের নিগূঢ় বিশ্লেষণ ও স্বরূপ প্রকাশে, একটা অতিপ্রাকৃত অনুভূতির উৎকন্ঠিত, শিহরণময় পরিবেশ রচনায়, অনুভূতি ও কল্পনার একক নবতর জগৎ সৃষ্টিতে প্রকাশের সার্থক ও কলামন্ডিত অজস্রতায় কবিও মানবচিত্তের গভীরে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পীর সংযুক্ত লেখনী থেকে এই গল্প কয়টির উদ্ভব হয়েছেন। এই গল্পগুলিতে এমন মাত্রাজ্ঞান – এমন পরিমিতিবোধ আছে যে পাঠকের মনে বিস্ময় রস চরম ভাবে সৃষ্টি করার পর মুহূর্তেই লেখক তাঁর লেখা শেষ করেছেন।

‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এ লেখক তাঁর আত্মীয়ের সঙ্গে দেশভ্রমণের পর কলকাতায় ফিরবার সময় ওয়েটিং রূমে অপেক্ষাকালীন সহযাত্রী তুলোর মাশুল কালেক্ট্ররের রচিত কাহিনী শোনেন। প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বে দ্বিতীয় শা- মামুদ ভোগবিলাসের জন্য বরীচের শুস্তা নদীর ধারে শ্বেত পাথরের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এখন সেখানে আমার (মাশুল কালেক্টারের) থাকবার ব্যবস্থা হয়। সারাদিন কাজ করার পর সন্ধ্যায় নদী তীরে ঘাটের নীচে আরাম কেদারায় বসে থাকবার সময় হঠাৎ মনে হয় সিঁড়িতে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল--- যেন অনেকে মিলে ছুটোছুটি করে আসছে। যদিও আমার(তার) সামনে কোন মূর্তি ছিল না তবুও স্পষ্ট শুনতে পায় যেন আমার(তার) পাশ দিয়ে কলহাস্যের সঙ্গে স্নানার্থিনীরা চলে গেল। এইভাবে প্রতিদিনই সন্ধ্যা হতে না হতেই কাজ সমাপ্ত হওয়ার আগেই আমি প্রাসাদ বাড়িতে ফিরে যাবার তাগিদ অনুভব করতে থাকি। যেন কেউ আমাকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানোর পূর্বে সামনের বড় ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন সভা ভঙ্গ করে সবাই চারিদিকের দরজা জানালা দিয়ে পালিয়ে গেল এবং আতরের মৃদু গন্ধে আমি আবেশে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি, তার কিছু পরেই শুনতে পাই ঝর ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপর এসে পড়ছে, সেতারে কি সুর বাজছে বুঝতে পারছি না কখনো বা আমার ঘন্টায় প্রহর বাজবার শব্দ, অনেক দূরে নহবতের আলাপ, বারান্দা থেকে খাঁচায় বুলবুলের গান, সমস্ত মিলে মিশে আমার চারিদিকে যেন একটা প্রেতলোকের সৃষ্টি করতে লাগল। রাত্রে শুয়ে আছি হঠাৎ যেন স্পষ্ট মনে হল কেও আমায় ঠেলছে আর আমি জেগে উঠার পর সে আমায় কোনো কথা না বলে ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলে, আমি তাকে অনুসরণ করে কত বারান্দা, কত অন্ধকার পথ, সভাগৃহ, গোপন কক্ষ পার হয়ে অবশেষে একটা ঘন নীল পর্দার সামনে এসে থমকে হঠাৎ আমায় নীচের দিকে আঙুলের নির্দেশ করে দেখায়। নীচে কিছুই ছিল না, কিন্তু অনুভব আর ভয়ে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল, মাটিতে কিংখাবের সাজ পরা একটা ভীষণ দর্শন কাফ্রি খোজা কোলের পরে খোলা তলোয়ার নিয়ে, দু’পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে বসে ঢুলছে। ভিতরে গালিচা পাতা ঘরের তক্তের পরে আসীন সুন্দরীর শুধুমাত্র চটি পরা দুটি সুন্দর পা, মেঝের এক পাশে স্ফটিক পাত্রে আপেল, নাশপাতি ইত্যাদি ও মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করে আছে আর সেই সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে এক অপূর্ব ধূপের মাদক সুগন্ধী এসে আমায় বিহ্বল করে দিল। হঠাৎ এক বিকট চিৎকারে চমকে চেয়ে দেখি আমি আমার খাটের উপর বসে আছি আর পাগলা মেহের আলি তার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে সকালে জনশূন্য পথে ‘তফাত যাও’, ‘তফাত যাও’ সব ঝুট হ্যায় করে চিৎকার করে চলেছে। এইভাবে বিভিন্ন ধরণের ঘটনা প্রতিদিন রাত্রেই ঘটতে থাকে আর মেহের আলির চিৎকারই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই মায়াবিনীর কাছ থেকে রক্ষার উপায়।

অবশেষে কুলি এসে খবর দেয় গাড়ি আসছে। সহযাত্রী তাঁর বন্ধুর সঙ্গে চলে গেলেন আর গল্পের শেষ শোনা হল না। এখানে গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃত পরিবেশের আবহমন্ডল রচনা করেছেন। কিন্তু এখানে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী মনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, সেখানে মেহের আলির চিৎকারই স্মরণ করিয়ে দেয় বর্তমানের জাগতিক রূপ। তাঁর অতিপ্রাকৃত পরিবেশ বর্ণনাও অসাধারণ। রোমান্টিক কবির লক্ষণ যেমন ইঙ্গিতে ভাবকে বেশি পরিস্ফুট করে তোলা, তেমনি রবীন্দ্রনাথও ইঙ্গিতে বাচ্যার্থকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছেন । কৌশলে দেখাতে চেয়েছেন অতিপ্রাকৃত রূপ। পাঠক যখন সেই পরিবেশে প্রায় নিমজ্জিত, তখন যেন লেখক নিছক কৌতূকভরে তাদের লক্ষ্য করেছেন আর হাস্যমুখে তাদের চমক ভেঙ্গে দিয়েছেন। মুহূর্তেই পাঠক ধরার ধরনীতে ফিরে এসেছে। গল্পগুলিতে তিনি দুই বিপরীত রস (ভয়ানক রস ও হাস্যরস) কে অত্যন্তে সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন। অথচ তাতে কোথাও ভাব ব্যাহত হয়নি। বরঞ্চ মনে এক করুণ রসই সঞ্চার করেছে। এ পরিবেশ শুধু কোনো মহাকবির পক্ষেই সম্ভব।

আবার কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অতিপ্রাকৃত বিষয়কে কেন্দ্র করে উপন্যাস ও বহু ছোটগল্প লিখেছেন। মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায় ও কিভাবে থাকে? এই জিজ্ঞাসা তাঁর মনে প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রশ্নটি দর্শন শাস্ত্রেরও মূল প্রশ্ন। এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে এই দর্শন মনষ্কতা উদ্ভূত চিন্তাশীলতা তাঁকে ভৌতিক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে, ফলে ভৌতিক অতিপ্রাকৃত রচনার এক বিশেষ অংশ তার লেখনি থেকে নিঃসৃত হয়েছে। ভৌতিক অতিপ্রাকৃত রচনার যা বিশেষত্ব এবং পরিবেশ তা তাঁর রচনায় পরিপূর্ণ ভাবে উপস্থিত। নির্জন, নিঃসঙ্গ পরিবেশ আর সেই পরিবেশে পোড়ো বাড়ি বা প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ আর সেই অনুযায়ী যে আবহমন্ডল তা তিনি রচনা করেছেন। ভৌতিক অতিপ্রাকৃত পরিবেশে যে রস নিঃসৃত হয় তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বীভৎস রসাশ্রিত। কোন কারুন্যের স্পর্শ সেখানে থাকে না।

পরলোক সম্পর্কে বিভূতিভূষণের মনে গভীর বিশ্বাস জন্মায় যৌবন বয়স থেকেই। নিজের পরলোক সম্পর্কে বিশ্বাসের কথা বিভূতিভূষণ একখানা চিঠিতে জানিয়েছেন বিশিষ্ট লেখক সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি লিখছেন –“আপনি পরলোক সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন, আমি সারা জীবন ধরে জন্ম-মৃত্যু রহস্যের আলোচনা করে ও রহস্য জেনে ফেলেছি। আমি গত পঁচিশ বছর ধরে Supiritualism আলোচনা করেছি। মৃত্যু যে বৃহত্তর জগতের দ্বার সেকথা আমি জানি, যখন আমার বয়স ২৭ বছর তখন থেকেই, প্রেত লোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছুই নেই”।

মোটকথা, এই অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক জগতের প্রতি লেখকের যে বিশ্বাস ও উপলব্ধি সত্য- তা থেকেই জন্ম নিয়েছে অতিপ্রাকৃত মূলক গল্প। এই গল্পগুলি তাঁর অন্তরের অনুভূতি ও বিশ্বাস থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

‘অভিশপ্ত’(বিভূতি রচনাবলী : প্রথম খন্ড, ১৩৩১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩০১) গল্পটি ভৌতিক অতিপ্রাকৃত শ্রেণির অন্তর্গত। লেখক একবার নৌকায় করে বরিশাল যাবার সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন এক ভদ্রলোক। রাত্রে বিশ্রামের জন্য খালের ধারে নৌকা বাঁধা হয়। শুতে যাবার সময় হঠাৎ শুনতে পান ‘সেই অন্ধকারে ঢাকা বিশাল বনভূমির কোন অংশ থেকে সুস্পষ্ট উচ্চ আর্তকরুণ ঝি-ঝি পোকার রবের মত তীক্ষ্ণ সুর তীরের মত জমাট অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে উঠলো, ‘ও গো নৌকা যাত্রীরা, তোমরা কারা যাচ্ছ...আমরা শ্বাস বন্ধ হয়ে মলাম...আমাদের ওঠাও ওঠাও...আমাদের বাঁচাও।

তাঁর সঙ্গী তাঁকে এই রহস্যের কথা বলেন। প্রায় তিনশ বছর আগে এই অঞ্চলে কীর্তিরায় নামে এক অত্যাচারী এবং দুর্দ্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। তার পাশের গ্রামের জমিদারের এক পুত্র ছিল, যে ছিল তার পুত্রেরই সমবয়সী। একদিন তার বন্ধু পুত্র নরনারায়ণ তার রাজ্যে বেড়াতে আসে। ফিরবার পথে জলদস্যুদের দ্বারা সে আক্রান্ত হয় এবং অবশেষে কীর্তি রায়ের গড়ে বন্দী হয়। কিন্তু কীর্তি রায়ের জিঘাংসা থেকেই তাঁর পুত্রবধূ বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল নরনারায়ণকে। সেই অপরাধে কীর্তি রায় তাকে সুড়ঙ্গে জীবন্ত অবরুদ্ধ করেছিলেন। নরনারায়ণ মুক্ত হয়ে কিছু দিন পর কীর্তিরায়ের রাজ্য আক্রমণ করে এবং শেষে কীর্তি রায় সপরিবারে অবরুদ্ধ হন তাঁর গড়ের মধ্যে। তাদের প্রাণ রক্ষার সেই তিরিশ বছর আগেকার আবেদন এখন কানে এসে পৌঁছায় ভিত যাত্রীদের। অন্ধকারে বনের এক গভীর অংশ থেকে কারা যেন আর্তস্বরে চিৎকার করে বলছে---“ওগো পথযাত্রীরা, ওগো নৌকাযাত্রীরা...আমরা যে এখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলাম... দয়া করে আমাদের তোল...ওগো আমাদের তোল...।” এক অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল গল্পটিতে। সেই জনমানবহীন জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত অঞ্চলে যুগে যুগে তারা সেখানে আবদ্ধ হয়ে আছে এবং মুক্তি না পাওয়ার জন্য আজ তিনশ বছর পরেও তাদের আর্ত চিৎকার শোনা যায়।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ ও বিভূতিভূষণের ‘অভিশপ্ত’ গল্পদুটি আলোচনা করে দেখা যায়---

প্রথমতঃ দুটি গল্পই ইতিহাস আশ্রিত। ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এর কাহিনি ২৫০ বছর পূর্বের দ্বিতীয় শা-মামুদের ভোগ বিলাসের জন্যে নির্মিত এই মর্মর প্রাসাদে তরুণী পারসিক রমণীদের স্নানলীলা ও সংগীতালাপ সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই ইতিহাস বা কিংবদন্তী সূত্রে তুলোর মাশুল কালেক্টরের একটা ধারণা ছিল। ‘অভিশপ্ত’-এ তিনশ বছর পূর্বের কীর্তি পাশার গড়ের কাহিনী সঙ্গী ভদ্রলোকও পূর্ব থেকে জানতেন এবং তিনিই কাহিনি বর্ণনা করেন।

দ্বিতীয়তঃ দুটি গল্পেই অতিপ্রাকৃত পরিবেশ দেখা যায়। নির্জন প্রদেশে প্রাসাদের অবস্থান এবং গড়ের অবস্থান, সেই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রেই নিঃসঙ্গতা রয়েছে।

তৃতীয়তঃ দুটি গল্পেরই সময়সীমা রাত্রিকাল।

চতুর্থতঃ ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এ করিম খাঁর মাধ্যমে কবি বলেছেন “এক সময়ে ওই প্রাসাদে অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিস্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তর খন্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে; সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়।’’

‘অভিশপ্ত’-এ সঙ্গীর মাধ্যমে লেখক জানতে পারেন—“বহুদিন থেকেই এখানে একটা ব্যাপার ঘটে থাকে। দুপুর রাতে গভীর বনভূমি যখন নীরব হয়ে যায়, হিন্তাল হিজল গাছের গুঁড়িগুলো যখন অন্ধকারে বনের মধ্যে প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে...সন্দ্বীপ চ্যানেলের জোয়ারের ঢেউয়ের আলোকোৎক্ষেপী লোনা জল খাড়ির মধ্যে জোনাকির মতন জ্বলতে থাকে তখন খাল দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে যেতে মোম-মধু সংগ্রাহকেরা কতবার শুনেছে, অন্ধকারে বনের এক গভীর অংশ থেকে কারা যেন আর্তস্বরে চীৎকার করছে ‘ওগো পথযাত্রীরা ওগো নৌকা যাত্রীরা...আমরা যে এখানে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেলাম...দয়া করে আমাদের তোল, ওগো আমাদের তোল। ভয়ে বেশি রাত্রে এপথে কেউ নৌকা বাইতে চায় না।”

অবশেষে বলা যায়, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এর জন্য রবীন্দ্রনাথ উপকরণ নিয়েছেন মধ্যযুগের ইতিহাস বিলাস লালসা আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশ থেকে। ভোগ প্রাচুর্যের অন্তরালে, অন্তঃপুর অঙ্গনাদের অন্তঃস্থলে যে ব্যথা-বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল বা ওঠে তারই এক করুণ আলেখ্য তুলে ধরেছেন। এতে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ আছে সত্য, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে মানব-মানবীর চিরকালের চিরন্তন হাহাকার। অতিপ্রাকৃত গল্প রচনার ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ এক বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য। অবধূত, বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির যে মমত্বহীন নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়, বিভূতিভূষণের রচনায় তা একেবারে অনুপস্থিত। অপার করুণা মিশ্রিত মানস দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারি হওয়ার ফলে বিভূতিভূষণ সেই অশরীরী অপার্থিব জগতের বাসিন্দাদের প্রতি মমতাবোধ প্রকাশ করেছেন। ফলে তাঁর রচনা শুধু অশ্রুসজলই হয়েছে তা নয়, মানবাভিমুখীও হয়েছে।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ-**

১) অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়- ‘বাংলা সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত’

২) ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’

৩) নগেন্দ্রনাথ বসু(সম্পাদিত)- ‘বিশ্বকোষ’

৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী প্রথম খন্ড

৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পগুচ্ছ প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড

সন্তসাহিত্য প্রসঙ্গ

সোমা দত্ত

হিন্দি সাহিত্যের উদ্ভব কালে এদেশে বিদেশীদের আক্রমণ এবং ভারতীয় সত্তার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ভারতীয় সমাজে রাজনৈতিক, ধার্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। হিন্দি সাহিত্যের মধ্যকালে অর্থাৎ ভক্তিকালে সেই অস্থিরতা প্রবলরূপ ধারণ করে।

ভক্তিকালকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উত্থান ও পতনের যুগ বলা চলে। শাসকেরা সামাজিক ও আর্থিক বিকাশের তুলনায় দণ্ডনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অবশ্য ফিরোজশাহ তুঘলক, শেরশাহ ও আকবর প্রমুখ শাসকের প্রজাদের হিতার্থে শাসন নীতিতে সংশোধন আনার চেষ্টা করেছিলেন। আকবর এবং আরও কয়েকজন শাসক শাসন ব্যবস্থাকে স্থায়ীরূপ প্রদান করতে সক্ষম হন। প্রজারাও তাঁদের উদারনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

সমসাময়িক কালের মুসলিম শাসকদের প্রায় অনেকেই হিন্দু ধর্মের প্রতি বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা হিন্দু জাতির প্রতি সময় বিশেষে অত্যন্ত নিষ্ঠুরও হয়েছেন। ভারতবর্ষে পূর্বেও বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাঁদের সঙ্গে কিছুকাল সংঘর্ষের পর ক্রমে সামঞ্জস্য দেখা যায় এবং তাঁরা ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেন। কিন্তু দশম শতাব্দীতে আগত মুসলমান জাতি ভারতবর্ষের হিন্দুদের সামাজিক ব্যবস্থাকে মানিয়ে নিতে পারেন নি। কখনও কখনও প্রবল বিরোধিতাও করেছেন। কারন হিন্দু ও মুসলমান জাতির আচার-ব্যবহার ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। বহু হিন্দু স্ব-ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। অপরপক্ষে মুসলমানেরা নিজেরা অন্য কোনো ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুগামী হওয়া মহাপাপ বলেই মনে করেছেন। এই সময় আত্মরক্ষার্থে হিন্দু জাতি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। বিশেষত হিন্দু স্ত্রী জাতির সামাজিক অধিকার ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীনে চলে যায়। এইরূপ পরিস্থিতিতে সমাজে বাল্যবিবাহ ও পর্দাপ্রথা এবং বহুবিবাহ, পুনর্বিবাহ ও সতীপ্রথা প্রবলরূপ ধারণ করে। মধ্যযুগে রাজকার্য, সাহিত্য, ধর্ম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় প্রবল আলোড়ন দেখা দেয়। সম্পূর্ণ দেশ হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি প্রধান পরস্পর বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম ধর্মের আগমনের পর হিন্দুজাতির মধ্যে জাতিপ্রথা, বর্ণসঙ্কীর্ণতা, ক্রমে আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল। অপরপক্ষে ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অবাধে প্রবেশাধিকার ছিল স্বীকৃত। সুতরাং হিন্দু সমাজে সম্মানীয় স্থান না পেয়ে,বহু স্থান না পেয়ে,বহু জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ভারতবাসীকে পূর্বে এইরূপে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় নি। কিন্তু এই সময়ে তাদের সামনে ইসলাম ধর্মরূপে সুসংগঠিত একটি সমাজ ছিল।

এই সংঘর্ষময় পরিস্থিতিতে কিছু মুসলিম শাসক হিন্দুদের রাজকার্যে সুযোগ দিয়ে উভয় জাতির মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। তবে পরিস্থিতির খুব বেশী উন্নতি হয়নি। শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, বিদ্বান, সূফী ও সন্তরাও পরিস্থিতির সংশোধন করে ভারতবাসীর জীবন সহজ করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং বিশেষ করে হিন্দি সন্তসাধকদের অবদান এক্ষেত্রে সর্বাধিক বলে স্বীকৃত। সূফী ও সন্তরা ছিলেন উদার প্রকৃতির এবং ধার্মিক সঙ্কীর্ণতা থেকে বহুদূরে। এদের আবির্ভাবের ফলে সমসাময়িককালে ভারতবর্ষে ভক্তিধারা প্রবাহিত হয়। কেউ সাকারবাদী ও কেউ নিরাকারবাদী ছিলেন। সন্তরা ছিলেন নিরাকারবাদী।

সন্তরা হিন্দু ও মুসলমান- এই উভয় ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা উভয় সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও বাহ্যিক আচার-বিচারের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা একদিকে হিন্দুদের জাতি-ব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতা, পূজা-ব্রত প্রভৃতির কঠোর বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে হিংসাত্মক প্রবৃত্তির মুসলমানদের নিয়মিত নামাজ পড়ার নির্থকতার কথাও বলেন। সন্তদের সাহিত্যকৃতির মধ্যে দিয়ে হিন্দি সাহিত্যের একটি নতুন দিকের বিকাশ হয়। এই যুগে ভাষা ও সাহিত্যের নানা পরিবর্তনও ঘটে। আরবী, ফারসী, প্রভৃতি বিদেশী ভাষার সমাবেশ ঘটে এবং নানা লোকভাষাও বিকশিত হয়। বহু ফারসী গ্রন্থের ভারতীয় ভাষার অনুবাদ হয়। ইসলাম শাসকেরা সংস্কৃত গ্রন্থ যেমন, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করান। বহু আরবী-ফারসী বিদ্বান সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানার্জনও করেন।

এই পরিস্থিতিতে মধ্যযুগে যে ভক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে, তার প্রভাবে ভারতবাসীর জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। এই ভক্তি-আন্দোলন পরবর্তী যুগকেও প্রভাবিত করেছিল। এর প্রভাবে ভারতবাসীর জীবনে নতুন দিক প্রবর্তিত হয়েছিল।

ভক্তি-আন্দোলনের মূল কারণ ভারতীয় চিন্তাধারার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, জা মধ্যযুগীয় হিন্দি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। সন্ত সাহিত্যের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের ভীত, সঙ্কুচিত, ত্রস্ত ভারতবাসীরা পুনরায় ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হন। এর প্রভাবে ভারতবাসী পুনরায় মনে আত্মবল ফিরে পান। এদিক দিয়ে সন্তসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্মরনীয়।

সন্তসাহিত্যে মধ্যযুগের সামাজিক ব্যবস্থা বিশেষত জাতি ভেদাভেদের প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বা প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। সন্তকাব্য সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নির্বাহ করেছে। মধ্যযুগে সমসাময়িক বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতবাসী যে আত্মবল ও মনোবল ফিরে পেয়েছিল, তার পশ্চাতে সন্তসাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সমাজে জাতিভেদের সমস্যা যে ভয়ানক রূপ ধারন করেছিল, সন্তসাহিত্যে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কারণ অধিকাংশ সন্তকবিরা ছিলেন নিম্নবংশজাত। যেমন, কবীর ছিলেন জোলা। রবিদাস ছিলেন চামার। ধর্ম বা জাতিভেদের সমস্যা বা অসারতা সম্পর্কে এঁরা সচেতন ছিলেন এবং এঁরা সকলেই মানবতার জয়গান করেছেন। সন্তবানীর প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে বিশৃঙ্খল সমাজ ঐক্যবন্ধনে কিছুটা আবদ্ধ হয়েছিল। এইভাবে সন্তসাহিত্যের মাধ্যমে মানুষে মানুষে দৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত করা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল।

তৎকালীন বর্ণভেদ প্রথা, সামাজিক সঙ্কীর্ণতা, ধার্মিক–আর্থিক–রাজনৈতিক অসামঞ্জস্যতার বিরুদ্ধে সন্তকবিরা যেমন মুখর হয়েছিলেন, তেমনি সেই পরিস্থিতি বিদূরিত করার জন্যও সচেষ্ট হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এইরূপ পরিস্থিতির প্রভাব থেকে জনজীবনকে পরিত্রাণ করার উদ্দেশ্যও তাঁদের ছিল। এরই প্রভাবে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। ভারতবর্ষের ভারতীয়তা রক্ষিত হয়েছে। হিন্দুদের দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাও হ্রাস দেয়েছে। স্তরভেদ ও বর্ণভেদও কিছুটা কম হয়েছে। আবার তথাকথিত পণ্ডিতবর্গের দ্বারা সন্তদের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রোশও মধ্যযুগীয় সমাজের লক্ষণীয় বিষয়। যাইহোক, সন্ত সাহিত্যের মধ্যে সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের পরিচয় বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের সমস্যা সঙ্কুল জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বোপরি ভারতবর্ষের যে প্রধান ধর্ম, মানবিকতার ধর্ম, সন্তসাহিত্যের মাধ্যমে ও প্রভাবে তা বিকাশ লাভ করে এবং ভিনদেশী মানুষেরাও ক্রমে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হন।

বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেও সন্তসাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সন্তবাণীর প্রভাব বলেই মানুষ আজকের বিশৃঙ্খল সমাজে জাতিবাদ প্রভৃতি বিপুল সমস্যার মাঝেও আত্মবল একেবারে হারায় নি। বিবেক ও মনুষ্যত্ববোধ এখনও হৃদয়ের অন্তরালে রয়েছে। প্রয়োজন উচিত পথ প্রদর্শকের। মানবিক বোধের অনুভূতি জাগানো ও হৃদয়ে উহা ধারণ করা- এটি বহু ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে ও হতে পারে তা সন্তবাণীর পাঠ ও আলোচনার দ্বারা। আজ সমস্যাসঙ্কুল অতিব্যস্ততার যুগ। এই পরিস্থিতিতেও সন্তসাহিত্যের অনুশীলনের মধ্যে মানুষ খুঁজে প্রেরণা।

আজ এদেশেরও কিছু জনসমাজ নিজেদের স্বার্থের জন্য বিভিন্ন উপায়ে মানুষের মনে জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণি, ভাষাগত, ভিন্নতাদি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। যার পরিণামে মানুষের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, হিংসা, বিচ্ছিন্নতা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠেছে। এইরূপ পরিস্থিতি থেকে মানুষ বিভিন্ন উপায়ে পরিত্রাণ লাভ ও পরিত্রাণ দানের চেষ্টাও করছে। এই পরিস্থিতিতে অনেকাংশে মানুষকে সহায়তা করবে সন্তসাহিত্য অনুশীলন।

মানব জীবনের আলেখ্য : ঘনরামের ‘শ্রীধর্মমঙ্গল’

সুমিতা চট্টোপাধ্যায়

আঠারো শতকের দোরগোড়ায় এসে সাধারণ মানুষ অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাসকে অনায়াসে স্বীকার করে নিতে পারেনি। জীবনকে যুক্তি দিয়ে বিচার করবার মানসিকতা দেখা দিয়েছিলো এ-সময়ের সমাজে। অবশ্য এর আগেই বাংলার ইতিহাসে ঘটে গেছে বহু সামাজিক ও ধার্মিক আন্দোলন। তার ফলস্বরূপই দেবদেবী-নির্ভর বাংলা সাহিত্যে ঘোষিত হয়েছে মানুষের জয়গান।তাই দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ আশা–নিরাশার খুঁটিনাটি বর্ণনা সেকালের কবিদের লেখনীতে উঠে এসেছিল খুব স্বাভাবিক ভাবে। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে লেখা ঘনরামের ‘শ্রীধর্মমঙ্গল’ কাব্যও তার ব্যতিক্রম নয়। সমস্ত মধ্যযুগ যে মঙ্গলকাব্যের প্রবাহে বয়ে চলেছিল অষ্টাদশ শতকে এসে সেই ধারায় এক অভিনব সংযোজন হল ঘনরামের এই কাব্য। অভিনব, কারণ জীবনমুখী। জীবন এতে প্রতিফলিত হয়েছে তার বাস্তব রূপ নিয়ে। কাব্যে মানুষই যেখানে প্রধান সেখানে সমাজ-সংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাস যে বড় হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্যের কী! ঘনরামের ‘শ্রীধর্মমঙ্গল’ পড়তে পড়তে আমরা দেখতে পাই সমস্ত কাব্যই সমকালীন মানব জীবনের আলেখ্য যা সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ করেছে তাঁর কাব্যকে।

যে-কোন মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতার খোঁজে গেলে দেখা যায় এর উৎস কোন না কোন সংগঠিত জনগোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্য রূপেই। যাকে লোকসাহিত্য বলা হয়, মঙ্গলকাব্যগুলি তারই লিখিত রূপ। ত্রয়োদশ শতকে এর উদ্ভাবন কাল বলা হলেও সে-সময়ের কোন লিখিত পুঁথি পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এক বিশাল সময়কাল ধরে লিখিত মঙ্গলকাব্যের ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি। বাহ্য দৃষ্টিতে এই কাব্যগুলি দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক মনে হলেও বাস্তবে বাংলার জনজীবনের কথাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

অনুমান করা হয়, ভারতবর্ষে গুপ্ত রাজবংশের শাসনকালের আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে বিশেষকরে ভগীরথীর পশ্চিম তীর থেকে ছোটনাগপুর পর্যন্ত যাকে রাঢ় ভূখণ্ড বলা হয়, সেখানকার লোকায়ত আরাধ্য দেবতা ছিলেন ধর্মঠাকুর। এই অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রথমে ধর্মঠাকুর পূজিত হলেও এখন বহু উচ্চবর্ণের হিন্দুও এঁর পূজা করে থাকেন।

রচনাকার হিসাবে ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য পুঁথির তুলনায় ঘনরামের কাব্য অনেকটা অর্বাচিন। কবি তাঁর কাব্য কবে থেকে আরম্ভ করেছিলেন তা স্মরণ করতে পারেননি। তবে তার সমাপ্তিকালের উল্লেখ রয়েছে ‘স্বর্গারোহন’ পালার শেষে –

শক লিখে রামগুণ রসসুধাকর।

মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।।

সুলক্ষ বলক্ষপক্ষ তৃতীয়াক্ষ তিথি।

যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি।।

অর্থাৎ ১৬৬৩ শকাব্দ বা ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম তাঁর কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক –

নূতন মঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গান।

মহারাজ কীর্তিচন্দ্রে করিয়া প্রণাম।।

ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও পূজা প্রচারই এই কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কাব্যের পাত্র ও কাহিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলেও এতে সমকালীন লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির যে সমস্ত উপাদান উঠে এসেছে তা বাস্তব।

রাঢ়ের বাস্তব ইতিহাসকে বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করে ও সেই অঞ্চলের জাতীয় চরিত্রকে অবলম্বন করে লেখা বলেই এই কাব্য অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে অভিনব। এখানে দেবতা নয়, সাধারণ মানুষ প্রাধান্য পেয়েছে। তাই বলা যায়, মানুষের জ্ঞাপক বলেই একটি উপজাতীয় দেবতাকে কেন্দ্র করে লেখা ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রচার প্রসার এত ব্যাপক হয়েছে।

ঘনরাম তাঁর ‘শ্রীধর্মমঙ্গল’ কাব্যকে মোট ২৪ টি পালায় ভাগ করেছেন। পালাগুলি যথাক্রমে – স্থাপনা পালা, হরিশ্চন্দ্র পালা, ঢেকুর পালা, রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা, শালেভর পালা, লাউসেনের জন্ম পালা, আখাড়া পালা, ফলানির্মাণ পালা, গৌড়যাত্রা পালা, কামদলবধ পালা, জামতি পালা, গোলাহাট পালা, হস্তিবধ পালা, কাঙুরযাত্রা পালা, কামরূপযুদ্ধ পালা, কানড়ার স্বয়ম্বর পালা, কানড়ার বিবাহ পালা, মায়ামুণ্ড পালা, ইছাইবধ পালা, অঘোরবাদল পালা, পশ্চিমউদয় আরম্ভ পালা, জাগরণ পালা, পশ্চিমউদয় পালা, স্বর্গারোহন পালা। এছাড়া সুরীক্ষার পালা নামে সবশেষে একটি অতিরিক্ত পালা রয়েছে। এই শেষ পালাটি সম্পর্কে সমালোচকেরা অনুমান করেন যে এটি ঘনরামের লেখা নয়। দ্বিজ ঘনরাম নামে অন্য কোন কবি এর রচনাকার।

কাব্যের নায়ক লাউসেনের জন্ম থেকে স্বর্গারোহন পর্যন্ত কাহিনি নিয়ে লেখা ধর্মমঙ্গল কাব্য। এখানে ধর্মের পূজা প্রচারের থেকে লাউসেনের আদর্শ ও বীরত্ববর্ণনাই বেশি দেখা যায়। সমকালের বিভিন্ন সামাজিক চিত্র, লৌকিক রীতিনীতি, সংস্কার, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও মানব চরিত্রের বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে কাব্যে। কাব্যের প্রথমেই দেখা যায় সৃষ্টি-প্রকরণ সম্পর্কিত চিরন্তন লোকবিশ্বাস –

পৃথিবী পাতাল স্বর্গ নাহি সুরাসুর বর্গ

দিবানিশি রবিশশী নাই।

নাহি জল জীব জন্তু বিষমপ্রলয় কিন্তু

এক ব্রহ্ম আছেন গোঁসাই।।

এই স্থাপনা পালাতেই আছে মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুসারে দেব অভিশাপের বর্ণনা। জগতজননী গণেশের মা ব্রাহ্মণী বেশে ইন্দ্রের নর্তকী অম্বুবতীর অহংকার চূর্ণ করবার জন্য তাকে অভিশাপ দেন- মর্ত্যে মানবী হয়ে তার জন্ম হবে, বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে তাকে ঘর করতে হবে এবং এক জন্ম মরে তবেই পুত্রের মুখদর্শন করতে পারবে। এই অভিশাপের মূল কারণ অবশ্য কলিকালে পৃথিবীতে ধর্মপূজা প্রবর্তন করা। যথারীতি অম্বুবতী রঞ্জাবতী নামে গৌড়েশ্বরের অধীন রমতি নগরে জন্ম নেয়।

সমকালে সমাজে প্রচলিত নবজাতকের বিভিন্ন সংস্কারের বর্ণনা ঘনরামের কাব্যে সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট ভাবে রয়েছে। কন্যা জন্মের পর ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা এবং সাত মাসে অন্নপ্রাশন সংস্কার করা হত যা পুত্রের ক্ষেত্রে ছিল ছয় মাসে। কাব্যে রঞ্জাবতীর অন্নপ্রাশন হয়েছে সাত মাসে এবং লাউসেনের ও কর্পুরের অন্নপ্রাশন হয়েছে ছয় মাসে। অভিজাত পরিবারে পুত্র জন্মের পর প্রচুর দান দেওয়ার প্রচলন ছিল। লাউসেনের জন্মের পর রাজা যে দান দিয়েছেন তা ‘হর্ষ হয়ে বোঝা বান্ধে নাপিত রজক’।

রঞ্জাবতীর গর্ভাবস্থার প্রথম মাস থেকে নয় মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত এবং নয় মাসে সাধভক্ষণের যে নিয়ম লোকসমাজে প্রচলিত ছিলো তার সুন্দর চিত্র এঁকেছেন ঘনরাম। গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন রুচির কোথাও রয়েছে কাব্যে –‘কুল কাসন্দি করঞ্জা অম্বলে যায় সাধ’। সাধভক্ষণের সময় যে সকল খাদ্য পরিবেশন করা হত তারও বর্ণনা রয়েছে

ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী চিনি চাঁপাকলা।

পাঁচপিঠা প্রচুর পায়েস পাতখোলা।।

মজা মত্তমান মিছরি মিশাইয়া দই।

কাছে বসি হরিষে খাওয়ায় কোন সই।।

প্রসবের পূর্বে গায়ে চন্দনের প্রলেপ লাগানো, দাসী দ্বারা রঞ্জাবতীকে হেঁটে বেড়ানোর উপদেশ, প্রসবের পর অচেতন রানিকে ‘গুঁড়ি ঝালে’ জ্ঞান ফেরানো প্রভৃতি প্রচলিত সংস্কারকেই তুলে ধরে।

ঘনরামের কাব্যে অনেকগুলি বিবাহের চিত্র রয়েছে। এ থেকে বিবাহের সময় সমাজে প্রচলিত লোকাচার ও স্ত্রী-আচারের নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। রঞ্জার বিবাহের সময়-

সুপদ্য বাজে বাদ্য মাদল মুরজাদ্য

মঙ্গল জয় হুলাহুলি।

নৃপতি নিকেতনে যতেক সখীগণে

মঙ্গল তম্বুল বিউলি।।

এরপর বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে কন্যার কপালে আশির্বাদ ছোঁয়ানো হয়। ধান, দূর্বা, ফুল, ঘৃত, দধি, চন্দন, সিন্দুর, কাজল, তাম্র, রূপা, সোনা, অলক্তক, দর্পণ, সরষপে, চামর, দীপ প্রভৃতি মঙ্গলকর দ্রব্যাদি সহকারে রঞ্জার অধিবাস সম্পন্ন হয়। হাতে তার মঙ্গলসূত্র বাঁধা হয়, কপালে দেওয়া হয় রত্নঝারা। গণেশ এবং ষোড়শ মাতৃকার পূজার পর বসুধারা দেওয়া হয় এবং নান্দীমুখ করা হয়। এরপর নানা বস্ত্র ও অলংকারাদি দিয়ে কন্যাকে বরণ করা হয়। বরকে মহিলারা কপালে চন্দন ও পায়ে দই ঢেলে বরণ করে। বরের মুখে তাম্বুল দিয়ে তার চারিপাশে সাতবার হেমথালা ঘোরানো হয়। তারপর কন্যা এসে দুহাতে পান ঘোরাবার পর কাপড় দিয়ে বরের মুখ ঢেকে ‘বরে প্রদক্ষিণ কন্যা করে সাতবার’। মালাবদল, বরকে গুড়সহ চাল ছুঁড়ে মারা, শুভদৃষ্টি, কন্যাদান, দক্ষিণা-যৌতুক দান, সিঁথিতে সিন্দুর দান, বৈদিক বিধানে গাঁটছলা বাঁধা, হোমাগ্নিতে খই ও ঘৃতের আহুতি দান এবং বিবাহ শেষে ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করে বসুধারা দিয়ে বর-কন্যাকে ঘরে তোলা, নববধূ ঘরে এলে আশির্বাদরূপে তাকে বহু ধনরত্ন দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে কাব্যে। লাউসেন-কলিঙ্গা ও লাউসেন-কানড়ার বিবাহের বর্ণনাও রঞ্জাবতীর বিবাহের অনুরূপ। কাব্যে এই তিনখানি বিবাহ সমকালের হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর বিবাহ অনুষ্ঠানের চিত্র তুলে ধরেছে।

পূজা-পাঠ, মন্ত্র-তন্ত্র, ব্রত-মানত, অভিশাপ-আশির্বাদ, শুভ-অশুভ, সংস্কার-কুসংস্কার, ইত্যাদির প্রতি যে সেকালের জনসাধারণের বিশেষ আস্থা ছিল, ঘনরামের কাব্যে তার পরিচয় রয়েছে। বিবাহিত নারীদের পুত্র প্রাপ্তির প্রবল আকাঙ্খা তাদের মানসিক সংস্কারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল। পুত্রহীন মাতাকে ‘আঁটকুড়া লোকে বলে মুখ নাহি চায়’। সেইসঙ্গে পুত্রের হাতে তর্পণ না পেলে পিতৃপুরুষদের অনন্ত হাহাকারেরও উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে সমকালীন কুসংস্কারের চিত্র পরিস্ফুট। তাই পুত্র প্রাপ্তির জন্য কঠিন ব্রত, তপস্যা, মানত ও ঔষধ ব্যবহার করবারও প্রচলন দেখা যায় কাব্যে। শালেভর পালায় রঞ্জাবতী শুভযোগে স্নান করে ‘আরম্ভিলা ধর্মপূজা হয়ে পুত্রকামা’। তাম্রপাত্রে জল তুলসী তিল কুশ দিয়ে গণেশাদি দেব দেবীর প্রথমে পূজা করা হল –

নানা বিধি উপচার পূজা বিধিরূপে।

ঘৃতে প্রদীপ ধূনা অন্ধকার ধূপে।।

আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।

পরিমাণ প্রচুর প্রফুল্ল পদ্মমালা।।

সেইসঙ্গে ধর্মপূজার বহু কঠিন পদ্ধতির চিত্র রয়েছে কাব্যে। যেমন – ‘ঊর্দ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয়’ আবার ‘মস্তক উপরে কেহ পুড়াইল ধূনা’। যজ্ঞকুণ্ডে জ্বলন্ত আগুনে প্রচুর ধূনা দিয়ে তার সম্মুখে ‘ঊর্দ্ধে বান্ধি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড’। রঞ্জাবতী তার আঁটকুড়ে নাম ঘুচাবার জন্য –

ঝলকে ঝলকে অগ্নি উঠে ধূনা বায়।

তায় লোটাইয়া রঞ্জা ধর্ম্মকে ধেয়ায়।।

ধর্মপূজার এমন কঠিন পদ্ধতি অঘোরবাদল পালাতেও দেখা যায়। সেখানে একাদশ দিবস কঠিন সাধনার উল্লেখ রয়েছে –

কাটারি শয্যায় কেহ করেছে শয়ন।

উরসি উজ্জ্বল করে জ্বালে হুতাশন।।

কেহ বিন্ধে কপালে উজ্জ্বল জ্বলে দীপ।

একান্ত হইয়া চিত্তে পূজে নরাধিপ।।

ধর্ম পূজা ছাড়াও আশ্বিন মাসে প্রতি ঘরে ঘরে অম্বিকার পূজা, শিবরাত্রি চতুর্দশী তিথিতে শিবের ব্রত, কামাক্ষ্যা, ভদ্রকালী, বাসুলী, হরি এমনকি পীরের আরাধনারও উল্লেখ রয়েছে ঘনরামের কাব্যে। তবে এ-সকল দেবদেবীর পূজাবিধি ধর্ম পূজার মতো কঠিন নয়।

স্বামীর মন যাতে অন্য স্ত্রীর প্রতি আকর্ষিত না হয় তার জন্য কন্যার বিবাহের সময় ঔষধ দেবার প্রচলন ছিল। রঞ্জাবতীর বিবাহের সময় মা মন্থরা ‘যত্নে আনিল ঔষধি’। আবার কামরূপ পালাতে কলিঙ্গার বিবাহের সময় ‘সোহাগে যোগাল এনে ঔষধের ডালা’। কাঙুরযাত্রা পালাতেও এই একই দৃশ্য দেখা যায়। শুধু বিবাহের সময়তেই নয়, পুরুষকে বশে করবার জন্য অন্যত্রও প্রচুর মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের ব্যবহার করা হত। গোলাহাট পালায় দেখা যায় – ‘অন্নে মাখে ঔষধ ব্যঞ্জনে পড়ে মন্ত্র’। লোকসমাজে তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, বলি ইত্যাদিতে যে বিশেষ আস্থা ছিল তা ঘনরামের কাব্যে বহু স্থানে দেখা যায়। মহামদ লাউসেনকে চুরি করবার জন্য ময়নাতে চোর পাঠালে কার্যোদ্ধারের জন্য চোর কালিন্দীর তীরে বালির কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। রক্তজবা ও নানান ফুল দিয়ে সেই মূর্তিতে পূজা করে অতপ ক্ষীর কলা প্রভৃতি দিয়ে নৈবেদ্য দিয়েছে। তারপর ঘৃতের প্রদীপ ও ধূপের ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার করে কালো সাদা জোড়া ছাগল বলি দিয়েছে। অন্যত্র গোলাহাট পালায় লাউসেনকে বশিভূত করবার জন্য সুরীক্ষাকে কামাক্ষ্যা দেবীর পূজা করে দ্বাদশ বলি দিতে দেখা যায়। কাঙুরযাত্রা পালায় বাশুলী দেবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ছাগ মেষ মহিষ বলি দেওয়া হয়েছে। বিপদে পড়ে দেবীর কাছে ‘হাতি ঘোড়া নরবলি দিব একলক্ষ’ বলে মানসিক করতেও দেখা যায়। শুধু তাইই নয়, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য মানুষ নিজের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয়েছে।

সমাজে চোরের প্রকোপ এত বেশি ছিল যে কে সাধু আর কে চোর তা নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। চুরির উপায় হিসাবে সিঁদ কেটে চুরির বর্ণনা করেছেন কবি। এখানেও মন্ত্র তন্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। মন্ত্র পড়ে চোরকে সিঁদকাঠিকে জাগাতে দেখা যায় –

জাগ্‌ জাগ্‌ জাগ্‌ মাটি কাজে লাগ মোর।

ময়না নগর জুড়ে লাগ নিদ্রা ঘোর।।

তারপর –

কাঁথে পরিমাণ আঁকে দিয়া পড়া মাটি।

শ্যামাপদ স্মরণে ফুটাল সিঁদকাঠি।।

লাউসেনকে কে চুরি করেছে তা জানবার জন্য গণনাও করতে দেখা যায়। তবে এসব থাকলেও মানুষের নিজ কর্মফলের প্রতি যে গভীর বিশ্বাস ছিল তারও প্রমাণ রয়েছে কাব্যে।

স্বামী সেবাই যে স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম – সমাজে প্রচলিত এই বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করেছেন ঘনরাম। তাই আখাড়া পালায় লাউসেনকে বলতে শোনা যায় –

সকল তীর্থের ফল ঘরে বসি করতল

পতিপদে ভক্তিবল যার।

জামতি পালায় এই লাউসেনের মুখে আবারও শোনা যায় –

স্বামী বিনা সংসারে নারীর নাই গতি।

ঘরে যেয়ে ভক্তিভাবে ভজ নিজ পতি।।

অথচ পুরুষের বহু বিবাহে কোন অধর্মের সংকেত পাওয়া যায় না। সমকালে প্রচলিত বহুবিবাহের চিত্র উঠে এসেছে লাউসেনের একাধিক স্ত্রী রাখার মধ্য দিয়ে। অবশ্য স্ত্রীরাও যে এই বহুবিবাহকে স্বীকার করে নিত মায়ামুণ্ড পালায় কলিঙ্গার সঙ্গে লাউসেনের বিবাহতে কানড়ার ভূমিকা থেকে তা স্পষ্ট। সেখানে দেখা যায় – ‘কানড়া করিছে হেথা কলিঙ্গার বেশ’। আবার অনেক ক্ষেত্রে পিতা দ্বারা কন্যাকে জোর করে সতীনের ঘোর করবার জন্য বাধ্য করলে কন্যা তা মেনে নিতে পারেনি –

মমতা না করে পিতা পাষাণ শরীর।

সতিনী চপলা আর কি করিব পতির।।

যুদ্ধে পরাজিত রাজা সন্ধি স্থাপনের জন্য বীরের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত এই রীতি যে সমকালীন সমাজেও ছিল তার উল্লেখ রয়েছে কাব্যে। গৌড়েশ্বরের কলিঙ্গার জন্য বিবাহের প্রস্তাব পাঠানোর মধ্য দিয়ে বৃদ্ধ পুরুষের সুন্দরী কন্যার প্রতি আকর্ষণের চিত্র উঠে এসেছে। অবশ্য এর বিপরীতে বৃদ্ধা স্ত্রীকে তরুণের প্রতি আকর্ষিত হতেও দেখা যায় গোলাহাট পালায়। এই পালাতেই এমন এক রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যেখানে স্ত্রীদেরই প্রাধান্য রয়েছে। আবার জামতি পালায় সুপুরুষ বীর লাউসেনকে দেখে নগরের স্ত্রীরা যে পতিনিন্দা করেছে এমন চিত্র প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই রয়েছে।

সমকালের সমাজে প্রচলিত সহমরণ প্রথার মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেছেন কবি তাঁর কাব্যে। স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হত। কুণ্ড রচনা করে চন্দন কাঠ, ধূনা ও কলস কলস ঘী ঢেলে তাতে আগুন জ্বেলে সতীরা তার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করত। আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার আগে সকলে সতীর চরণে প্রণাম করত। সতী সকলের গায়ে আম্র ডাল বুলিয়ে আশীষ দিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিত –

বিশাল বাজনা বাজে রসাল মৃদঙ্গ।

কাংশ করতাল বাঁশি শশীমুখী শঙ্খ।।

লাউসেনকে মৃত ভেবে চারজন রানি তার মায়ামুণ্ড নিয়ে সহমৃতা হতে যাবার সময় এমনই দৃশ্য দেখা যায়। মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানযাত্রার চিত্র বর্তমান হিন্দুর শ্মশানযাত্রার অনুরূপ। প্রজা, বন্ধু বান্ধব সকলে মিলে হরিবোল ধ্বনি দিয়ে সেকালে শ্মশানযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হত।

ঘনরামের কাব্যে অনেক যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে। যুদ্ধ যাত্রার সময় শুভ-অশুভ বিশেষ ভাবে মানা হত। যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় কাব্য থেকে। তীর,গুলি-বন্দুক, কামানের মত আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে খাঁড়া, ফলা, ধনুক, শেল, ঢাল-তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রের প্রচলনও ছিল। যুদ্ধের সময় দুন্দুভি, দামামা, রণশিঙ্গা প্রভৃতি বাজানো হত। তবে আনন্দ-উৎসব ও পূজার সময় গমক, বীণা, ঢাকঢোল, শিঙ্গা, কাড়া, কাঁসর, মৃদঙ্গ, মাদল, ডমুরি, ঝাঝরা, করতাল, বাঁশী, মূরজ, ডম্ফ, ভেরী, শঙ্খ প্রভৃতি বহু বাদ্যযন্ত্র যে সমকালে প্রচলিত ছিল তার উল্লেখ করেছেন ঘনরাম তাঁর কাব্যে।

সমকালে প্রচলিত খাদ্যেরও এক বিশাল তালিকা দিয়েছেন ঘনরাম তাঁর কাব্যে। তবে শ্রেণীবিশেষে তা অনেকাংশে ভিন্ন। চোরদের প্রিয় খাদ্য ছিল পোস্ত, সুরা ও সিদ্ধি। ডোম সমাজে মদ ও মাংসের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। গোলাহাট পালায় লাউসেনের জিন্য সুরীক্ষা শাক, সূপ, মূগচনা, সুরসাল দিয়ে ঝাল, ঝোল, কদলী, পটল, ওল, মানকচু, কুন্দরকী, বেগুন, শিম ঘীয়ে জব জব করে ভাজা, থোড়, অপক্ব নারকেল, পনস, পানিফল সিয়ে সুক্তা, দই চিনি দিয়ে আমের অম্বল, ক্ষীর রান্না করেছে। সেইসঙ্গে –

উড়ি চেলে গুঁড়িকুটি সাজাইল পিঠা।

ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা।।

ঘৃতপক্ক লুচি পুরী নাগর উদ্দেশে।

অপূর্ব উড়ির অন্ন রন্ধে অবশেষে।।

মায়ামুণ্ড পালায় লাউসেনের জন্য কলিঙ্গা ও রঞ্জাবতীকেও প্রায় একই রকম রান্না করতে দেখা যায়। এর থেকে সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রচলিত খাদ্যবস্তুর এক বিশাল তালিকা পাওয়া যায়।

পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী উপজাতিদের মধ্যে ডোম চরিত্র ঘনরামের কাব্যে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। এদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে ডোম সম্প্রদায়ই ধর্মঠাকুরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পূজক। ডোম ছাড়া এই পূজা সম্পূর্ণ নয়। তাছাড়া ডোমদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবও ধর্মপূজা। নিম্ন শ্রেণীর হলেও বীরত্ব ও সততার জন্য এরা রাজার বিশ্বাসপাত্র ছিল। এছাড়া তাঁতি, তেলি, তাম্বুলি, মদক, মালি, জেলে বণিক, কুমার,শাঁখারী, কর্মকার, কলু, কৈবর্ত, ছুতার প্রভৃতি বহু অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের সমাজে স্থান ছিল। সমাজে হিন্দু–মুসলমানে যে বিশেষ কোন ভেদাভেদ ছিল না তার পরিচয় রয়েছে হস্তিবধ পালায়। সেখানে মীর, মিঞা, মোগল, পাঠান, খোরসান ও ক্ষত্রিয়, চৌহান, রাজপুতকে একাসনে বসে দেশের রক্ষার জন্য মন্ত্রণা করতে দেখা যায়। বলা যায়, ধর্মভেদ বা জাতিভেদ সমকালীন বাংলার সমাজে প্রবল ভাবে ছিল না বলেই ঘনরামের কাব্যে কোথাও তা স্থান পায়নি। বাংলায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতির ভেদকে যেমন কম করেছিল, তেমনই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেও দূরত্ব কম করেছিল। শ্রীচৈতন্যের এই আদর্শই উঠে এসেছে ঘনরামের কাব্যে। কাব্য রচনাকালেও কবিকে বহুবার শ্রীচৈতন্যকে স্মরণ করতে দেখা যায়। জাতি ধর্মের ভেদাভেদ থেকে দূরে সরে মানুষ যে সুস্থ সমাজ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তারই ফলস্বরূপ লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের সৃষ্টি। গৃহস্থের জন্য সবচেয়ে বড় ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, গুরু ও অতিথির সেবা করা। এঁদের সামান্যতম নিরাদরই যে গৃহস্থের নরক বাসের কারণ হতে পারে, সমকালের এই লোকবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছেন কবি তাঁর কাব্যে।

সমাজের ধর্ম বা নিয়ম রক্ষা না করলে কোন গ্রামকে যে একঘরে করে দেওয়া হত তা জামতি পালায় দেখা যায়। এই পালাতেই তৎকালীন ভ্রষ্টা নারীদের সাজ-সজ্জার বিস্তৃত ও নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে –

আঁচড়িয়া চাঁচর চিকুর চিত্রবেণী।

বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বাঁ দিকে টালনী।।

... ... ...

গলায় লম্বিত মাল্য মনোহর ফুল।

... ... ...

কপালে সিন্দুর ফোঁটা প্রভাতের রবি।

চন্দন চন্দ্রিমা কোলে কজ্জলের ছবি।।

তায় চিত্র গোরোচনা চন্দনের বিন্দু।

ভুরুযুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু।।

আরোপে অলকা কোলে মুকুতার পাঁতি।

সীমন্তে রচিয়া দিলা সুবর্ণের সিঁথি।।

অঙ্গের পরে অপূর্ব্ব অনেক অলংকার।

প্রবালে পুরট পাঁতি গজমতি হার।।

দোসূতি তেসূতি মতি হেম কণ্ঠমাল।

গোরা গায়ে গজমতি গর্ব্ব করে ভাল।।

নাসার বেশর পরে করিয়া লাবণ্য।

পরের পুরুষে ভ্রষ্টা ভুলাবার জন্য।।

সেইসঙ্গে কানে কনক-কাটা কড়ির কুণ্ডল, হাতে কঙ্কণ, বাজুবন্ধ, কটিতে কিঙ্কিণী, পাদাগ্রে পাসুলী, পায়ে মল প্রভৃতি বহু অলংকারে সজ্জিত হত এই নারীরা। অবশ্য লাউসেনের সঙ্গে বিবাহের সময় কলিঙ্গার সাজ সজ্জাও প্রায় অনুরূপ। শুধু নারীই নয়, পুরুষের সাজ সজ্জা, বস্ত্রালংকারেরও বর্ণনা রয়েছে কাব্যে–

যতনে রতন মণি রাজ আভরণ।

নানা বর্ণ পরে কর্ণসেন নন্দন।।

অঙ্গুরী অঙ্গদ হেম হীরা মণি গলে।

ঢল ঢল কুণ্ডল দুলিছে গণ্ডস্থলে।।

বাহুমূলে বাজুবন্দ বিরাজিত বেশ।

ধর্ম্মের কবচ তাই বিঘ্ন করে শেষ।।

কর্ণসেনের দুই পুত্র লাউসেন ও কর্পুরের বিদ্যারম্ভের মধ্যে দিয়ে সমকালীন লোকজীবনের শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় –

অকারান্ত ককারান্ত জানা হইল স্বর।

ককারাদি ক্ষকারাদি হল বর্ণা পর।।

অভিলাষে আঙ্ক আস্ক ফলাদি বানান।

... ... ...

অষ্টধাতু অষ্টসিদ্ধি সুবন্ত আনর।

পড়িল অঙ্কের ভেদ বুদ্ধে করি ভর।।

ধাতুনাম শব্দভেদ পড়িল অপর।

বেদ-এর জ্ঞানের জন্য পাণিনি পড়বার উল্লেখও রয়েছে কাব্যে। গোলাহাট পালায় সুরিক্ষার ধাঁধা হেঁয়ালীর আকারে প্রশ্নের মধ্য দিয়ে নারীশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণ সেনের পুত্রদ্বয় দ্বারা তার উত্তর দানের মধ্য দিয়ে বাংলার লোকজীবনে ধাঁধাঁ হেঁয়ালীর দ্বারা রস সঞ্চারের চিত্র উঠে এসেছে। সুরিক্ষার একটি হেঁয়ালীর উত্তর খুঁজতে গিয়ে লাউসেন বেদ–বেদান্ত, অষ্টাদশ আগম পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ, হারাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ সন্ধান করেছে। এথেকে তৎকালে বিদ্বানসমাজে প্রচলিত গ্রন্থাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়। রাজসভার বর্ণনায় রাজা ও পণ্ডিতদের বিভিন্ন শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করতেও দেখা যায়। কানড়ার বিবাহ পালায় লাউসেনকে লেখা গৌড়েশ্বরের পত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পত্রলিখন পদ্ধতিরও পরিচয় রয়েছে। প্রথমে সম্বোধন করবার পর সুভাশীষ কুশল কামনা করা হতো। তারপর বিষয় লিখে পত্রশেষে তারিখ ও স্বাক্ষর করা হতো। পশ্চিমউদয় পালায় কলিঙ্গাকে লেখা লাউসেনের পত্রের লিখন পদ্ধতি একই। তবে এখানে প্রজার হাতে নয়, পাখির গলায় বেঁধে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

বাংলার বহু লোক-প্রবাদ ঘনরামের কাব্যে যেমন সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে তেমনই তাঁর রচিত বহু পদও বর্তমানে প্রবচন রূপে বাংলায় লোকমুখে প্রচলিত। যেমন-

* পুত্র বিনা গৃহ যেন পদ্মপাত্রে জল।
* সুবৃক্ষ চন্দন গন্ধে সুশোভিত বন।

সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন।।

কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।

কুবৃক্ষ কোটরে অগ্নি উঠে বন দহে।।

* করতলে কত ধন পরান বাঁচিলে।
* বচনে বচন বাড়ে বিবাদের মূল।
* ঘৃতের কলস নারী পুরুষ অনল।

একযোগে থাকিলে অবশ্য করে বল।।

* দারীর দর্শনে পুণ্য স্পর্শে মহা পাপ।
* কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে।

কতক্ষণ রয় শিলা শূণ্যেতে ফেলিলে।।

* বিনাশকালে বিপরীত মতি।

আপনি হ ইলে সৎ অসতে কি করে। প্রভৃতি

এই আলোচনা থেকে আমরা পাই ঘনরামের ‘শ্রীধর্মমঙ্গল’ কাব্যে মানব জীবন ও সমকালের সমাজের চিত্রই প্রধান হয়ে উঠেছে। কাব্যের প্রতিটি চরিত্র গঠিত হয়েছে লোকায়ত বিশ্বাসকে আশ্রয় করে। রঞ্জা, লাউসেন, কানড়া, কর্পূর, কর্ণসেন, কালু প্রভৃতি চরিত্রগুলি সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের দিকটিকে যেমন উদ্ভাসিত করেছে, তার পাশাপাশি নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্রও রয়েছে বহু। সমাজের এই নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করবার জন্য কাব্যে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীর উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন কবি। কাব্যে যেমন অভিজাত বর্গের চিত্রণ রয়েছে তেমনই দারিদ্র্যের চিত্রাঙ্কণেও কবি কুশলতা দেখিয়েছেন। গৌড়রাজের উক্তিতে একদিকে দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে আবার তার বিপরীতে মহম্মদের অত্যাচারের বর্ণনাও রয়েছে। একদিকে দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগ অন্যদিকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রতি নজর, একদিকে সতী নারী অপর দিকে ভ্রষ্টা নারীর চিত্রণ, মিথ্যা কথন - এ সবই সমসাময়িক সমাজের বাস্তবিক রূপ ও মানব জীবনের বৈচিত্র্যময় দিককে উদ্ভাসিত করেছে।

শামসুরের ‘আন্তিগোনে’ : বিকীর্ণ পাঠ ।।

ঋতম্‌ মুখোপাধ্যায়

শক্তিশালীদের তুমি দাওনি নিষ্কৃতি,

দ্বিধাসংশয়ের

সঙ্গেও করনি রফা, অন্যায় করেছে যারা

ভুলতে দাওনি তুমি কখনো তাদের অপরাধ –

তোমাকে জানাই নমস্কার।

(বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট্‌ । অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

আন্তিগোনে প্রতিবাদী, আন্তিগোনে বিদ্রোহিণী। রাজকন্যা সে, রাজপুত্র হাইমোনের বাগদত্তা; তবু রাজসুখ-কে হেলায় তুচ্ছ করে সে পথে নামে। সম্পর্কে মামা, ভাবী শ্বশুর এবং থীবেস-রাজ ক্রেয়োনের নির্দেশ অমান্য করে সে এক ভাইয়ের শেষকৃত্য পালনে অগ্রসর হয়। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আন্তিগোনে তার মানবিক কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে রাজি নয়। থীবেসের ট্র্যাজিক নায়ক অয়দিপাউসের কন্যা আন্তিগোনে নির্ভয়া। পাশে যদি সহোদরা ইসমেনেকে নাও পায় তবু তার কর্তব্য আর সঙ্কল্প থেকে তাকে টলানো অসম্ভব। হাইমোনের ভালোবাসা, ক্রেয়নের অনুরোধ সব ঠেলে দিয়ে সে তর্ক করে। নারী হয়েও পুরুষের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। তার মৃত্যু ক্রেয়োনের চোখ খুলে দিয়ে যায়। একটি অকালমৃত্যুর মূল্যে পুত্র, স্ত্রী এবং রাজত্ব সব হারিয়ে একলা ক্রেয়োন হাহাকার করে। তার দম্ভের হাত ধরে আসে পতন। আনুমানিক ৪৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সোফোক্লেসের কলমে অবিস্মরণীয় গ্রিক ট্র্যাজেডি ‘আন্তিগোনে’র নায়ক ক্রেয়োন, নায়িকা আন্তিগোনে। নিয়তি বাহিত এই ট্র্যাজেডির ভিতরে এক দুঃসাহসিকা নারীর কণ্ঠস্বর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিশ শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সেই বিদ্রোহিণীকে নতুন-ভাবে নির্মাণ করেছেন ফরাসি নাট্যকার জাঁ আনুই, দণ্ডদাতা ক্রেয়োনের বিবেচনাবোধ আর অসহায়তাও নবনির্মিত। ব্রেশটের ‘আন্তিগোনে’ শীর্ষক জার্মান নাটক-কবিতায় হিটলারের ছায়া, কারুণ্যের বদলে তিক্ত বিদ্রূপ কিংবা কবিতা সিংহ ও শামসুর রাহমানের ‘আন্তিগোনে’ কবিতা; এমনকি দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকের জাহানারা-চরিত্রে আন্তিগোনের এই আপসহীন মহিমা বিকীর্ণ হয়েছে। আজও সাহিত্যে, শিল্পে, সমাজে যেখানেই একলা মেয়ের প্রতিবাদী কণ্ঠ উদ্যত হয়, হৃদয়ধর্মকে যে-নারী অস্বীকার করে না কোনো মূল্যেই, সেখানেই যেন পুনর্নির্মিত হয় ‘থীম’ আন্তিগোনে।

২। ‘আন্তিগোনে’ শব্দের অর্থ জন্মের বিরুদ্ধে বা মাতৃত্ব বিরোধিতা। যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে শুধু জন্ম দেবে বলে বেঁচে থাকে, সেই শ্রেণিতে আন্তিগোনে পড়ে না। মানবীচেতনার আধুনিক ভাষ্যকারেরা অনায়াসে আন্তিগোনে-কে তাদের ‘আইকন’ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। আর সেই নিরিখেই আমাদের পড়ে ফেলতে হয় একটি অসামান্য কবিতা ‘আন্তিগোনে’। কবিতা সিংহের ‘হরিণাবৈরী’ (১৯৮৫) কাব্যের অন্তর্গত এই দীর্ঘ কবিতার অনুপ্রেরণা কেয়া চক্রবর্তী-রুদ্রপ্রসাদ অভিনীত ‘আন্তিগোনে’র বাংলা রূপান্তরের মঞ্চায়ন। এখানে কবির চোখে আন্তিগোনে-ক্রেয়োন-ঈডীপাস এক ফ্রেমে এসে ধরা পড়েছে। পুরুষেরা হিসেবী, নারীদেহের কৌমার্য আর সংসার, শিশুর দায়িত্ব পালনে তাদের ঠেলে দিতে চায়। বিস্ময় আর প্রশ্ন খচিত এই কবিতা। সব সৌন্দর্য আর আনন্দ নিয়ে ক্রেয়োনের মতো পুরুষদের সামনে মাথা উঁচু করে থাকা সতেরো বছরের নারী আন্তিগোনের বন্দনা এই কবিতা। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে :

তুমি বুকে রেখেছিলে মৃত্যুবীজ তীব্র সহজাত?

যেভাবে, স্বভাবে, বুকের ভিতর বয়, মিথ্যার যন্ত্রণা কিছু

স্বতন্ত্র ঝিনুক!

আন্তিগোনে!

তোমার উন্নত বুকে ঈশ্বরেরো ছিল আয়োজন

তোমার বস্তির সুগঠনে থেবাই-এর অনাগত নৃপতির

প্রথম দোলনা!

তবু তুমি ত্যাগ করে চলে গেলে দুধের ধারার সেই নিঃসরণ-সুখ

প্রসবের দুষ্প্রাপ্য আস্বাদ

কারণ তুমি যে সতেরোর ভীষণ সকালে

জেনেছিলে সত্যিকার কিছু পেলে, কিছু, - কিছু তো ছাড়তেই হয়

মাংস ও শরীর।

আন্তিগোনে, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ করে মাতৃ-গমন

স্বীকারে সাহস রাখে শুধু ইডিপাস

আর একমাত্র সেই ইডিপাসই

জন্ম দিতে জানে তোকে, তোকে আন্তিগোনে!

রাজা অয়দিপাউসের ঔরসকে ‘জ্যোতির্ময়’ বলেছেন কবি। তাঁর আন্তিগোনের ভিতরে চিরকালীন নারীর অসহায়তা এবং প্রতিবাদের সত্তাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন তিনি। আর তার পাশে দেখি, ওপার বাংলার কবি পঞ্চাশের শামসুর রাহমান তাঁর ‘বন্দি শিবির থেকে’(১৯৭২) কাব্যের একটি কবিতা লিখেছেন আন্তিগোনে-কে নিয়েই। কবিতাটি দশটি স্তবকে বিন্যস্ত, দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে আমাদের মনে দোলা সঞ্চার করে। তবে এ-কবিতা হালকা মেজাজের নয়। আমাদের ভাবনালোকে কবি যেন এক আবাহনমন্ত্রের আবহ তৈরি করেন। দেবীবন্দনার মতোই যেন মিথের জগৎ থেকে তাকে টেনে আনতে চান সমকালে। একাত্তরে স্বাধীন বাংলার জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কবি রুক্ষপথে ব্যাকুল কণ্ঠে আন্তিগোনেকে ডাক দিয়েছেন। মৃত্যুচিহ্নিত দেশকালে তাঁর চোখে সেই আন্তিগোনের চিত্র এইরকম :

শহর মরু বিজন বড়,

নীরব তো সব গায়ক পাখি।

আন্তিগোনে, আন্তিগোনে

রুক্ষ পথে ব্যাকুল ডাকি।

প্রেত নগরী নগ্ন, ফাঁকা,

নেই যে ভালো একটি প্রাণী।

দরদালানে রাস্তা ঘাটে

ভাসছে শুধু মৃতের ঘ্রাণই।

আন্তিগোনে নামেই যেন

একলা চলার করুণ পথ।

আন্তিগোনে তুমিই জানি

বস্তু-ছেঁড়া নীল শপথ।

লক্ষণীয়, মরু, বিজন, প্রেতনগরী, নগ্ন, মৃত, করুণ, নীল : এই সব শব্দের ব্যবহার করে প্রথম তিন স্তবকে কবি চেনাতে চান আন্তিগোনের নিঃসঙ্গতা, বেদনাদীর্ণ সংগ্রামকে। যেখানে অবাধ মৃত্যু, হত্যা আর নির্মম উল্লাস সেখানেই ঘটতে পারে মানবিক মমতায় দৃঢ়চেতা আন্তিগোনের আবির্ভাব। পরবর্তী চারটি স্তবকে সেপাই, সান্ত্রী, প্রহরী, রাজাদেশ এইসব প্রতিবন্ধকতার ছবি আঁকা হয়েছে, যাকে হেলায় তুচ্ছ করতে পারে আন্তিগোনেই। এহেন উদার নারীর পুনরাবির্ভাব মুক্তিযুদ্ধের অক্লান্ত মৃত্যুর মিছিলে অনিবার্য বলে ভেবেছেন শামসুর। শেষে কবি মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের শবের দিকে তাকিয়ে লেখেন :

সহোদরের ছিন্ন শরীর

করলে আড়াল সংগোপনে।

সৎকার সে তো উপলক্ষ,

অন্য কিছু ছিল মনে।

আন্তিগোনে দ্যাখো চেয়ে –

একটি দুটি নয়কো মোটে,

হাজার হাজার মৃতদেহ

পথের ধুলায় ভীষণ লোটে।

রৌদ্রে শুকায় রক্তধারা,

মাংস ছেঁড়ে শবাহারী,

কে দেবে গোর দুর্বিপাকে?

নেই যে তুমি উদার নারী। (আন্তিগোনে)

শামসুরের কবিতায় আন্তিগোনে একনায়কী রাষ্ট্রে শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তোলার সাহস এবং নারীসুলভ মমতা, সেবাধর্ম বড়ো হয়ে উঠেছে। আর একালেও যখন নারীর উপর অত্যাচার সংঘটিত হয়, মাংসের প্রতিমা রূপে তারা কেবল ধর্ষিতা হতে থাকেন, তখনও আন্তিগোনের স্মৃতি জেগে ওঠে, কারণ আন্তিগোনে আত্মশক্তির জাগরণের কথা বলে।

৩। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের ‘কামদুনির আন্তিগোনেরা’ (এবেলা / ২১জুন ২০১৩), আমাদের দেশের জরুরি অবস্থার সময় তাঁর ও কেয়া চক্রবর্তীর অভিনীত আন্তিগোনের কথা স্মৃতিপটে রেখে লিখেছিলেন :

‘নতুন নতুন ভাবে এই প্রযোজনা শুভবুদ্ধির, শুভশক্তির কথাই বলেছে এবং বহুমানুষ প্রাণিত হয়েছেন, সঞ্জীবিত হয়েছেন। এতে প্রমাণ হয়, যত মানুষ ‘আন্তিগোনে’ পড়েছেন বা দেখেছেন, আমাদের এই বহুধা সময়েও তাঁরা সেই ভীরু অথচ ভীরুতা-জয়ী প্রতিবাদী মেয়েটিকে দেখে নিজেদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন তাকে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। তাহলে? তাহলে তো একথাই স্পষ্ট যে, আন্তিগোনেরা আছে। তারা থাকে।’

গ্রিক মিথের অন্য যে-গল্প আন্তিগোনে-কে হাইমোনের বিবাহিত স্ত্রী এবং মেইওনের মা হিসেবে দেখায় এবং পরে ক্রেয়োন সেই সন্তানের হত্যা করলে তারা আত্মহত্যা করে, জানায়, তা আমাদের সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পারে না। বরং দেশ-কাল নির্বিশেষে গ্রিক মিথোলজি থেকে সাহিত্যের পাতায় উঠে আসা প্রতিবাদী আন্তিগোনেই আমাদের আকর্ষণ করে, উদ্দীপনা জোগায়। এভাবেই থীম পরম্পরায় বাহিত ‘আন্তিগোনে’-র নানা ভাষ্য এবং দেশ-বিদেশের প্রযোজনা নারীশক্তির জাগরণে, অন্যায় প্রতাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আশ্রয়দাত্রী কিংব প্রতিবাদী সাহসিকা মেয়েরা, মৈমনসিংহগীতিকাগুলিতে মহুয়া, মলুয়ার প্রেমের জন্য সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই, স্বার্থত্যাগ কিংবা রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’র নায়িকা সর্দারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অথচ প্রেমিকা নন্দিনী-র ভিতরেও কি কোথাও নেই আন্তিগোনের দূরান্বয়ী স্মৃতি? সেও তো লড়াইয়ে এগিয়ে গেছে সকলের সঙ্গে, মরতে ভয় পায়নি। আর তার মরবার সাহস রাজাকেও নতুন উপলব্ধিতে জাগিয়ে দিয়েছে। আন্তিগোনে তাই চিরকালের নাটক, প্রতিবাদের ‘আধুনিক’ প্রত্নপ্রতিমা। কবিতার দর্পণেও তাই সেই একলা নারী আন্তিগোনের ছবি প্রতীকী ও সার্থক হয়ে ওঠে। আন্তিগোনে আমাদের কাছে এমনই এক ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’, অশঙ্কিত মুক্তিদূতী।

সহায়ক গ্রন্থ

১) সোফোক্লেসের ‘আন্তিগোনে’ । ভাষ্য ও ভাষান্তর : শিশির কুমার দাশ (প্যাপিরাস, ১৩৯১/ ২০০৪)

২) আন্তিগোনে । সোফোক্লেস । অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৬৩/২০০২)

৩) বাংলা নাটকের দিক্‌দিগন্ত । তরুণ মুখোপাধ্যায় (একুশ শতক, ২০০৫)

৪) কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা (দে’জ পাবলিশিং/১৯৯৮)

৫) শামসুর রাহমান । কবিতা সংগ্রহ (পুনশ্চ, ২০১০)

৬) এবেলা । উত্তর-সম্পাদকীয় (২১জুন ২০১৩)

ফুল ফুটুক না ফুটুক, কিন্তু

যে কবিতা মানেই ‘আজ বসন্ত’

আকাশ বিশ্বাস

“ফুল ফুটুক না ফুটুক / আজ বসন্ত।”

শান বাঁধানো ফুটপাথের পাথুরে বর্ম ভেদ করে একটা ‘কাটখোট্টা’ গাছ তার কচি-কচি পাতা মেলে দিয়েছে দেখে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতার ইতিহাসে এই যে অমর হয়ে যাওয়া পঙ্‌ক্তিটি লিখেছিলেন একদা, কবির মৃত্যুর পর একটা দশক কাটতে চলল, লোকের মুখে মুখে প্রচারিত ও প্রচলিত হতে হতে কখন যেন প্রবাদেই পরিণত হয়ে গেল প্রায়! উৎসবে, ব্যসনে, রাজদ্বার অথবা রিয়েলিটি শো’র আসরে, প্রাপ্তিতে, সম্পূর্ণতায়, উল্লাসে, বিজয়ে, বৈভবে, জেনে অথবা না-জেনে, ‘ফুল ফুটুক’ কাব্যগ্রন্থের ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক’ কবিতাটি পড়ে অথবা না-পড়ে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কত ভাবেই না আমরা উচ্চারণ করি ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক / আজ বসন্ত’, এই অবর্থ পঙ্‌ক্তিটি।

সময়টা ’৫১-৫৭। অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে লেখা হয়েছিল ‘ফুল ফুটুক’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি এবং ইতিহাসের সামান্য ছাত্র হওয়ার সুবাদে এটাও আমরা এতদিন জেনে গেছি যে সময়টা বড়ো সুখের ছিল না। সদ্য স্বাধীন একটা দেশ, সঙ্গে দেশ-বিভাগের দগদগে ঘা, দু’শো বছরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণে ফোঁপরা হয়ে যাওয়া অর্থনীতির সঙ্কট তৎসহ বিপুল উদ্বাস্তু আগমনের ভবিতব্য। স্বাধীনতার খবর জুটলেও দেশবাসীর বরাতে খাবার জোটেনি সে’ সময়। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি তখন যেন স্বপ্নের সওদাগর। স্বপ্ন ফেরি করেছে দ্বারে দ্বারে। নিরন্ন কৃষকের কাছে, বন্ধ কারখানায় শ্রমিকের কাছে যুবক, ছাত্র, শিক্ষকের কাছে। আর সেই অগন্য স্বপ্নদর্শী শ্রেনি সংগ্রামীর মিছিলের একজন ‘পদাতিক’ হিসেবেই মূলত বাংলা কবিতা লিখতে চলে এসেছিলেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় নামের এক-মাথা ঝাঁকড়া চুলের উদ্দাম একটি সদ্য যুবকও। সুভাষের নিজের কথায় বললেঃ “ ছোটোবেলায় যখন আমি লেখা শুরু করি, আমার লেখা এবং খানিকটা রাজনৈতিক যে জীবন, এটা বরাবর এক সঙ্গে চলেছে। স্বাধীনতার আন্দোলন আমাকে প্রেরণা দিয়েছে, লিখতে আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু যখন seriously আমি লিখতে শুরু করেছি, তখন এই প্রশ্ন উঠেছে যে এটা কি লেখার সময়, না এখন রাজনীতি করার সময়? কারণ আগে দেশকে স্বাধীন করতে হবে, তারপরে আমরা অন্য কথা ভাবব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি না লিখে পারিনি।” (দ্রঃ পাঠকের মুখোমুখিঃ লোথার লুৎসে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ-৪৯)

প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পদাতিক’-এই সুভাষ একদা অবলীলায় ভেঙে দিয়েছিলেন বাংলা কবিতার তৎকালীন সীমা ও সম্ভাবনার সকল ধারণাযোগ্য বৃত্ত, ব্যাসার্ধ, পরিমাপ অথবা পরিসীমাগুলিকে। কী সাধারণ পাঠক কী সমালোচক-সব মহলেই আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল সে’ সময়। বাংলা ছন্দ নিয়ে বছর –একুশের তরুণ বা প্রকৃতপক্ষে তরুণতম কবিটির ‘নানারকম দুঃসাহসী পরীক্ষায়’ বা ‘নতুন ধ্বনি অন্বেষণের দিকে’ সচেতন-প্রচেষ্টার মতো বিবিধ প্রচেষ্টা নিয়ে সে পৃষ্ঠা ভরিয়ে ফেলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু বা প্রবোধচন্দ্র সেনদের মতো স্বনামধন্যরাও। পয়ারের নাকি (এই নাকি’টা লিখে ফেললাম স্রেফ বাক্‌চাল হিসেবে) এক নতুন সম্ভাবনা ও স্বরূপ খুলে দিয়েছিলেন সুভাষ সেদিন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘কবিতা সংগ্রহে’র প্রথম খন্ডে তথ্যগুলি অতিযত্নে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন সম্পাদক সুবীর রায়চৌধুরী মহাশয়। কিন্তু সে সব তো অন্য প্রশ্ন। কবিতার কারিকুরির জন্য তো আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় হননি। উত্তাল চল্লিশের অসমাপ্ত বিপ্লবের দিনে ‘মে দিনের কবিতা’ লিখেছিলেন তিনি, লাল উল্কিতে চিনে নিতে বলেছিলেন পরস্পরকে; মেহনতি মানুষের চিনে নিতে দেরি হয়নি- তার হয়ে ওকালতি করে কবিতা লিখতে আসা এই অসম্ভব ক্ষমতাবান কবিটিকে। সময় ও সম্ভবনা; এই দুইয়ে মিলে রাতারাতি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল তাঁকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে তখন যেন এক বিস্ফোরণের প্রতিশব্দ। কাছে-পিঠের সেই সময়ে, ব্যক্তি মানুষটা তখন পথ হাঁটছিলেন ‘জনযুদ্ধের গান’ গাইতে- গাইতে। আর এই হাঁটাপথে একটা বেয়াড়া গাছকে পাথর ফুঁড়ে ফুটে উঠতে দেখলে- তিনি যে তার মধ্যে সর্বহারা মেহনতি মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াবার মেটাফোর খুঁজে পাবেন; সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে যে জানে, চেনে; তার কাছে আর আশ্চর্য কী !

অথচ কবিতাটি নাকি ছিল কোনো একটা পুজো সংখ্যায় লেখার তাগিদায়। কলেজস্ট্রিটের ভাষায়-যাকে বলে ফরমায়েসি লেখা। একটা সাফাই অবশ্য দিয়ে গেছেন সুভাষ নিজেইঃ “ কবিতাটি যদিও আমি লিখেছিলাম কোনো পুজোসংখ্যায় লেখার তাগাদায়, কিন্তু কবিতাটি ঠিক একদিনের লেখা নয়। বলা যায় যে অনেক বছরে এর পেছনে রয়েছে- হয়তো লেখার দিক থেকে নয়, কিন্তু এর কিছু কিছু expression, কিছু কিছু শব্দ যা অনেক আগে আমার মনে আলাদা আলাদা ভাবে দানা বেঁধে ছিল। আর এর ছবিগুলো, বলা যায় যে ছোটোবেলা থেকে বড় হওয়া, এই সমস্ত সময়ের মধ্যে আমার অর্জিত।” (দ্রঃ পাঠকের মুখোমুখিঃ লোথার লুৎসে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ-৪৪) ।

মূল কবিতাটি পড়লে বোঝা যায়- কথাগুলো সাফাই ছিল না আসলে, সত্যি ছিল। এই কথাগুলি মিথ্যে হলে লেখা যায় না ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক’ এর মতো অমর কবিতা।

সত্যিই বুকের ভিতর লুকিয়ে অথবা মাথার ধূসর কোষে মুখ বুজে থাকা ছবিগুলোর রঙে আঙুল ডুবিয়ে কী চিরকালীন ছবিটাই না এঁকেছিলেন সুভাষ সেদিন !

“শান-বাঁধানো ফুটপাথে

পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠ খোট্টা গাছ

কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে

হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক

আজ বসন্ত।”

পরবর্তীকালে কার্য-কারণ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেনঃ“আমার ছেলেবেলা কেটেছিল খুব ছেলেবেলা কলকাতার বাইরে মফস্বল শহরে ।গ্রামে আমি থেকেছি, ফলে প্রকৃতির উপর স্বাভাবিক ভাবেই আমার একটা টান ছিল, যে প্রকৃতিকে আমি কলকাতায় এসে অনেকটা পরিমাণে হারিয়েছিলাম”।তবু “...যেমন ফুটপাথে যে সমস্থ গাছ বড়ো হয়ে ওঠে, যার চারিদিকে থাকে শান বাঁধানো জমি, যেটা আমার জীবনে বরাবর এমন একটা ছবি, এমন একটা প্রতীক হিসাবে দেখা দিয়েছে যা এখনও ভোলা যায় না”। (দ্র।ঐ )

কিন্তু এ তো শুধু প্রকৃতির কবিতা নয় কোনোভাবেই। কবি নিজের কথায় “... আমি একটা সময়ে এ কবিতাটা লিখেছিলাম যখন মোটের উপর কলকাতার খুব একটা আশাভঙ্গের অবস্থা। নানারকম রাজনৈতিক কারণে মানুষের একটা দমবন্ধ ভাব”। (দ্র । ঐ, পৃ ৪৪- ৪৫ )

আর এই কালবেলা যেন কেটে যায় দ্রুত। আর কখনো যেন না ফিরে আসে রাহুগ্রাসের অমানিশা। যে কালো রাত্রি আর অন্ধকার দিনের স্রোত উপুর্যপরি দু’শো বছর ধরে বয়ে গেছে পোড়া দেশটার উপর দিয়ে তা যেন একেবারেই যায়। সুভাষ তাই আতঃপর লেখেনঃ

“আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে

তারপর খুলে

মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে

তারপর তুলে

যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে

যেন না ফেরে।”

এই কবিতার পঞ্চম স্তবকে আমরা দেখি কবির মনে পড়ছে একদা হলুদ রং এর নরম বিকেলে একটা দুটো পয়সা পেলে কোকিল ডাকতে ডাকতে চলে যেত যে অযানা অচেনা হরবোলা ছেলেটা ;তার কথা ।কোকিল ডাকা এই ছেলেটাই নাকি একসময় অনেকখানি পূরণ করে দিত কবির জীবনে প্রকৃতিহীনতার শূন্যতা।

তাকেও আজ কোন্‌ অচিন দেশে যেন ডেকে নিয়ে গেছে-চলে যাওয়া দিনগুলো। যে দিনগুলো একবার চলে গেলে, ক্যালেন্ডারের পাতায় আর ফেরে না কখনো। কিন্তু অন্ধকার, মানুষ খেগো, মৃত্যুময় দিনরাত- না চাইলেও বারবার ফিরে আসে মানব সভ্যতার ইতিহাসে। আর ব্যাক্তি সুভাষ, রাজনৈতিক কর্মী সুভাষ, কবি সুভাষ। যেহেতু তিমির বিলাসীনন কোনও ভাবেই, যেহেতু তিমির বিলাসী হতে চেয়েই তার কলম হাতে তুলে নেওয়া; তাই এই জাতীয় শুভ ইচ্ছার কথা – যা এই কবিতার চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকে বলেছেন সুভাষ; তা তো তাঁর শিল্পীসত্তার এক অতিচেনা এক অভিজ্ঞান।

কিন্তু এই আন্তরিকতাই কি আমাদের আলোচ্য কবিতাটিকে এতখানি মহত্ত্ব দিয়েছে? পাঠক জানেন তা নয়।

এই কবিতার ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম স্তবকে এসে যে অবিসংবাদিত একান্ত ছাঁ-পোষা ঘরোয়া কন্‌টেক্‌স্ট্‌ ও কলুকাল বাক্‌চালে সুভাষ যখন বলেনঃ

“লাল কালিতে ছাপা হল্‌দে চিঠির মতো

আকাশটাকে মাথায় নিয়ে

এ-গলিতে এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে

রেলিঙে বুক চেপে ধরে

এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিল

ঠিক সেই সময়

চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল

আ মরণ! পোড়ার মুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!

……………

তারপর দড়াস ক’রে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

……………

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে

দড়ি পাকানো সেই গাছ

তখনও হাসছে।।”

তখন এসেই বস্তুত অনায়াসের অভাবনীয় শক্তিমত্তায় পাঠক মাত হয়ে যান। সহজ করে সহজ কথা বলা যে বস্তুত এতখানি সহজ হতে পারে, লালকালিতে ছাপা হলদে হয়ে যাওয়া সনাতন প্রাচীন চিঠি যে আকাশের উপমা হতে পারে, সামান্য কয়েকটি রেখায় আঁকা জাপানি ছবির মতো একটি চিত্রকলা; অর্থাৎ একটি প্রজাপতির উড়ে এসে বসা কালো কুৎসিত আইবুড়ো মেয়েটার গায়ে এবং সবটা মিলিয়ে কবিটির নিজস্ব বাক্‌চাল, একটা গুমোট আবহ, আর সেই অন্ধকারের অন্তরালে বেয়াড়া, কাঠাখোট্টা গাছটার বিপ্রতীপ উপস্থাপনা-যে বিচিত্র বর্ণালী, যে মোক্ষম ম্যাজিক তৈরি করে, তা যেন সত্যিই ছাপিয়ে যায়, বর্ণনার সব সামর্থকে।

কবি নিজে হয়তো বলবেনঃ “এর মধ্যে একটা যেমন বেদনা আছে, যেমন একটা কালো মেয়ের কথা আছে-আই বুড়ো কালো মেয়ে, দেখতে ভালো নয়। এটা, যারা বাংলাদেশে বড়ো হয়েছে, গ্রামে থেকেছে, মফঃসলে থেকেছে, তারা এ কালো মেয়ের যে বেদনা সেটা জানে। এবং তার গায়ে প্রজাপতি উড়ে এসে বসলে যে আশা জাগে এবং পরক্ষনেই সে আশা যে পূরণ হবে না একথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার যে আশাভঙ্গ, এ সমস্ত কিছু আশা, আশাভঙ্গ, এবং তা সত্ত্বেও ফুল না ফুটলেও বসন্তের জেগে ওঠা- এটা কোনো ব্যক্তি জীবনের নয়, হয়তো সেই সময়ের খানিকটা প্রতিচ্ছবি এ কবিতায় পড়েছিলো।” (দ্রঃ ঐ পৃ ৪৫)

কিন্তু শুধু তো সেই সময় নয়, এই সময়েও কি পাল্টেছে ছবিটা? আমাদের পৌরাণিক দেবতা থেকে শুরু করে ব্যাসের দ্রৌপদী অথবা কালিদাসের যক্ষিণী-যতোই তারা কৃষ্ণা হোক না কেন, যতোই আধুনিক কবি শিরোমনি কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ দেখে ‘কালো, তা সে যতোই কালো হোক’- গেয়ে উঠুন না কেন, সেই মেয়েতে ‘কুচ্ছিত’ বই ভিন্নতর কিছু দেখার চোখ যেহেতু কলোনিয়াল হ্যাংওভার আক্রান্ত, সর্বত্র ফেয়ার অয়ান্ড লাভলি’র বিজ্ঞাপণ বিদূষিত এই সমাজে দাঁড়িয়ে আমরা অর্জন করতে পারলাম না অদ্যাবধি সেই জন্যই অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে দড়ি পাকানো; কবিতার এই গাছটি আসলে কানাগলির ‘কালোকুচ্ছিত’ আইবুড়ো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে যতোটা না হাসে তার চেয়ে বেশিজোরে বোধ হয় হেসে ওঠে আমাদের মতো মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে। যারা সুভাষের ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক’ নামের এই কবিতার কালো মেয়েটার মর্মযন্ত্রণার ব্যাখ্যা লিখে পরীক্ষায় অনেক নম্বর পাওয়ার জন্য খাতা ভরিয়ে ফেলতে পারি কিন্তু বিয়ের বাজারে কন্যা তেমন গৌরী না হলে মন গলে না কিছুতেই।

শুধু ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক’ কবিতার ‘কালোকুচ্ছিত’ মেয়েটার গায়েই চোখের মাথা খেয়ে উড়ে এসে বসে ‘পোড়ার মুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি’ একটি। আর তারপর! কেবল শুনতে পাওয়া যায় সেই মেয়েটির ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটা দড়াম শব্দ। প্রজাপতির নির্বন্ধে যে মেয়ের অনিমন্ত্রণ-হায় তার গায়েই উড়ে এসে বসে প্রজাপতি! ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক’ কোনো দিনই যেহেতু তার জীবনে বসন্ত আসে না; এক মর্মন্তুদ বিপ্রতীপ সর্বত্র-বিরাজিত বৈপরীত্যকে সম্বল করেই এই কবিতার কাঠ খোট্টা গাছটা শেষ পর্যন্ত যেনহেসে ওঠে মুখোশপরা মেকি, মহান, চলমান মনুষ্য-সভ্যতার মুখের দিকে তাকিয়েই!

কবিতাটা শেষ হয়ে যায়! কিন্তু একটা চিন্তা মাথার মধ্যে বিলি কাটতে থাকে যেন। অনেককাল আগের সেই এক শিশু রক্তকরবী গাছ! এই একই শহরের আর এক কবির জানলার বাইরে লোহার জঞ্জাল ভেদ করে উঠে দাঁড়িয়ে যেন গোটা সভ্যতার দিকে তাকিয়ে বিনীত অথচ ভয়হীন কন্ঠে যে একদা জিজ্ঞাসা করেছিলঃ “ ...আমাকে মারতে পারলে কই?” (দ্রঃ রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহঃ প্রমথনাথ বিশী, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি,পৃ ২৬০) সেই মৃত্যুঞ্জয়ী গাছটার সঙ্গে এই কাঠখোট্টা গাছটার সত্যিই কী অদ্ভুত মিল !

গাছের ও পুর্ণজন্ম হয় কি না কে জানে !

চল্লিশের দশকের ভাঙ্গাগড়া ও বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিচ্ছবি

গৌতম মণ্ডল

ব্রিটিশ সরকারের শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য হিন্দু ও মুসলমান কোন সম্প্রদায় হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে তোলাই যেন এক সময় সকলের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে ভারতবর্ষ প্রায় খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানদের যৌথ প্রচেষ্টায় সেটা রোধ হয়ে যায়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পরেই যেন ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্রমশ সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। একদিকে বাঙ্গালিরা যেমন ভারতীয়তার অভিমুখি এবং হিন্দি বলয়ের দিকে ধাবমান, তেমনি হিন্দুধর্মে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে নিজেদেরকে। বিশ শতকের ইতিহাস চেতনায় এবং রাজনৈতিক ভাবনায় নব্য ইসলামি ও নব্য হিন্দুয়ানি আজ পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে আঘাত করেছে দুই সম্প্রদায়কে। বাঙ্গালির ইতিহাসও যেন ধীরে ধীরে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় জাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায় বাংলাদেশে ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কালে কালে তার মধ্যেও শুচি বায়ুগ্রস্ত গোঁড়ামি প্রবেশ করেছিল। হিন্দু ও মুসলমান নামে দুটি পৃথক সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেল। দুবর্ল হতে লাগল বাঙালি শব্দের ইতিহাস। ১৯২৬ সালে এপ্রিল মাসে যখন কোলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল তখন নজরুলের মত আরও অনেক মানুষকে বিচলিত করে তুলেছিল। হিন্দু আর মুসলমান পরস্পর বিরোধী হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কবি নজরুল তাঁর আত্মকথায় বলেছেন –“আমাদের মনে হয়েছিল যে, এই নগরের লোকেরা অতি মুসলমান কিংবা অতি হিন্দু হয়ে গেছে।’’ দুটি সম্প্রদায়ের এই ঘনীভূত অসন্তোষ চরমতম পর্যায়ে এসে পৌঁছাল চল্লিশের দশকে।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল তাকে দূর করতে চেয়েছিল অশ্বিনী দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ ও ফজলুল হকের মতো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব দিতে চেয়েছিলেন মুসলমানদের। কিন্তু তাতে সবথেকে বড় বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল হিন্দু কায়েমি স্বার্থবাহীরা। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর কংগ্রেস মুসলিম লিগের এই দাবী বাতিল করে দেয়। ১৯৩৭ সালে বাংলার আইন পরিষদে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন করে মুসলিম লিগ ক্ষমতায় আসে। সব থেকে বড় ধাক্কা আসে ১৯৪০ সালে জিন্নার পাকিস্থান প্রস্তাবে। যদিও ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যবর্তী সময়েই মুসলমানরা দ্বি-জাতি তত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন। এই প্রস্তাবের দাবী ছিল, মুসলমানরা যেকোন সংজ্ঞা অনুযায়ী এক সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ই নয়, তারা একটা পৃথক জাতি এবং ভারতবর্ষকে স্বশাসিত জাতীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশদের অনুরোধ করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবের কার্যকরী অংশের তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত ছিল-“ এই দেশে কোন সংবিধানের পরিকল্পনা কার্যকরী হবে না বা মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হবে না, যতক্ষণ না তারা নিম্নলিখিত মূলনীতি গুলির উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যথা অঞ্চলগত ভাবে অবিচ্ছিন্ন এলাকা গুলোকে প্রয়োজনানুসারে এমন ভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে যাতে একাধিক স্বাধীন রাজ্য গঠিত হয় এবং যে স্থানগুলো নিয়ে এই রাজ্যগুলো গঠিত সে গুলোও স্বাধীন ও স্বয়ং শাসিত হবে।’’ এর ফলাফল হল এই রকম যে, ১৯৪৩ সালে যখন সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশদের সাথে লড়াই করবে তার প্রাক্কালে মুসলমানরা বিশেষত মুসলিম লিগ এসে দাঁড়াল ব্রিটিশদের পাশে। হিন্দু মুসলিমের যৌথ সম্পর্ক একেবারে মুছে গেল।

দ্বি-জাতির ধারনায় বিশ্বাসী বাঙালি মুসলমানরা ভাবলেন পাকিস্থান মানে হিন্দু জমিদারের পীড়ন থেকে মুসলমান চাষীর মুক্তি। প্রজাসত্ব প্রাপ্তি, চাষীর ঋণ পূর্ণ মকুব। এছাড়াও বাঙালি মুসলমানদের থাকবে আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার, অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা। ১৯৪০ সাল থেকেই বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্থানকে তাদের স্বপ্ন স্থান মনে করতে থাকে। কার্জনের কৌশল নীতিতে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান মানস প্রথম দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং পরবর্তী কালে এই দুই বাঙ্গালির মধ্যে এই বৈষম্য আরও চরমে ওঠে চাকরি ও শিক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে। জাতীয় ঐক্যের পিছনে ভাষা মস্তবড় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভাষাগত বিরুদ্ধতাও তাদের মানসিক ভাবে পৃথক করেছিল। আব্দুল লতিফ মুসলমানদের বাংলা চর্চার বিরোধিতা করেছিলেন। আবার বঙ্কিমচন্দ্রই এক সময় বলেছিলেন-“যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমান দিগের এমন গর্ব থাকিবে যে, তাহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙালা তাহাদের ভাষা নহে, তাহারা বাঙালা লিখিবেন না, কেবল উর্দু ফার্সির চালনা করিবেন ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূলে ভাষার একতা।” ভাষাগত এই টানাপোড়েনও এক সময় বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দূরত্ব স্থাপন করে দিয়েছিল। উনবিংশ শতকের যুগান্তকারি পরিবর্তন থেকে মুসলমানরা নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল। মুসলমানরাও এক সময় পাশ্চাত্যের শিক্ষা লাভ করে হিন্দুদের ধরে ফেলে এবং শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে বিশেষ অধিকার দাবি করতে থাকে। এর ফলে বঙ্গদেশ আবার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার হল। তিরিশের দশকের পর থেকে যত দিন অতিবাহিত হয়েছে ততই এই স্বতন্ত্র মানসিকতা রাজনৈতিক সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে।

বিশের দশকে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের আন্তরিক ইচ্ছাকে হিন্দু নেতারা উপেক্ষা করেছিল। তিরিশের দশকের শেষভাগে ও চল্লিশের দশকের প্রথমে এল মুসলমানদের পালা হিন্দুদের উপর প্রতিশোধ নেবার। বহু সাংবিধানিক পরিবর্তন হওয়াতে মুসলমানরা নিজেদের নবলব্ধ রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। চল্লিশের দশকে এসে ধর্মীয় ভাবে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানদের ঐক্যকে সবথেকে বেশি দুর্বল করে দিয়েছিল। মুসলমানরা প্রথম শুরু করল বকর ইদের সময় প্রকাশ্যে গো হত্যা, যা তাদের নব জাগরিত অধিকার বোধকে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে হিন্দুরাও হটে না গিয়ে মসজিদের সামনের রাস্তা দিয়ে বাজনা বাজিয়ে দূর্গা প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা নিয়ে যেতে শুরু করল। এতে দুই সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে গেল এবং মাঝে মাঝে হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটতে লাগল। হিন্দু ও মুসলমানদের এই যে বিভাজন নীতি তাকে অনেকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করলেও এর পিছনে যে গভীরতর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারন ছিল তা অস্বীকার করা যাবে না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এই কারন গুলো উপলব্ধি করতে না পেরে উপেক্ষা করেছিল এবং পরিস্থিতি সহজ করতে এমন ভান করেছিল যেন এই পার্থক্য কোনদিন ছিলই না। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ মন্ত্রী লেবার পার্টির নেতা স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস যে প্রস্তাব নিয়ে ভারতে এসেছিলেন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলে হয়তো চল্লিশের দশকের দুর্ভাগ্যজনক সাম্প্রদায়িক ঘটনাগুলো এড়ানো যেত।

দেশভাগ দ্রুত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে। কেননা এই সময় নোয়াখালীর দাঙ্গা, বিহারের হত্যাকান্ড ও পাঞ্জাবের গৃহযুদ্ধ ব্রিটিশ সরকারকেও ভাবিয়ে তোলে। ১৯৪৬ সালে কোলকাতায় যে হত্যাকান্ড হয়েছিল তার পিছনে ছিল নোয়াখালীর হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা ও বিহারের মুসলমান বিরোধী দাঙ্গা। এই দুটি ঘটনাই বাংলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে আরও বিষিয়ে দিয়ে ফেরবার পথ বন্ধ করে দেয়। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীতে যে দাঙ্গা হয়েছিল সেদিন ছিল হিন্দুদের লক্ষ্মী পূজা। মুসলমান আততায়ীদের সংগঠিত দল সন্ত্রাস ছড়াতে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করে। হিন্দুদের ধনসম্পদ তো লুঠ করেই, তার সাথে চলে জোড় করে হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করা ও ধর্ষণ করে মুসলমান করে দেওয়া। এই দাঙ্গায় হিন্দুরা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নোয়াখালীর নৃশংসতা যে বঙ্গবিভাগের পক্ষে বাঙালি হিন্দুদের মনোভাব দৃঢ় করে তুলতে একটি বড় ভূমিকা নিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর পর এলো বিহারে হিন্দুদের পালা মুসলমানদের হত্যা করার। বিহারের এই ঘটনায় নোয়াখালীর থেকে বেশি যেটুকু হয়েছিল তা হল গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর পর আবার পাঞ্জাবের গৃহযুদ্ধ। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানরা হিন্দু ও শিখদের বিতাড়িত করে তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিতে চেয়েছিল। এর ফলে হিন্দু ও শিখরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গা শুরু করল। ফলে হিন্দু আর মুসলমানরা যেন চিরকালের জাত শত্রুতে পরিণত হয়ে গেল।

দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষকে শাসন করতে করতে এক সময় যেন ব্রিটিশ সরকার নিজে থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে কলকাতা, নোয়াখালী, বিহার ও পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্রিটিশদের আরও ভীত করে তোলে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সদ্য নির্বাচিত লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী ভারতের বড়লাট ওয়াভেলকে দিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়ে ছিল যে, ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বশাসন দেওয়া হবে। যেন ভারতের স্বাধীনতা ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে পারলেই রেহাই পায়। ১৯৪৫ সালে যা হতে পারত তা হল ১৯৪৭ সালে। মাঝের এই দুই বছর চলছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছিল যে, ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যব্দধতা যত তাড়াতাড়ি সৃষ্টি করতে পারবে তত তাড়াতাড়ি ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়বে। ভারত ছাড়া নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের তাগিদ যেন বেশি ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্ট উপমহাদেশ ভারতবর্ষ দুই শতাব্দী ব্যাপী ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি লাভ করল, এবং এরই সাথে বাংলাও দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুরা ভারতবর্ষে রয়ে গেল আর বাঙালি মুসলমানরা হিন্দু প্রধান দেশ ত্যাগ করে পাকিস্থানে চলে গেল। বঙ্গ বিভাগ সাহিত্যিক আখতার উজ্জমান ইলিয়াস লিখেছিলেন-“এমন বিপর্যয়, এত শোচনীয়, এত হৃদয় বিদারক ও অর্থহীন যে আমরা প্রত্যেক দিন অধিকতর ভাবে উপলব্ধি করছি এটা এড়ানো যেত।” প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় মন্তব্য করেছিলেন- “তারা শিশুদের মৃৎপাত্র ভঙ্গ করার মতো বঙ্গভঙ্গ করছে।’’ আবার ভবানী সেন ভারত বিভাগ তথা বঙ্গ বিভাগকে বর্ননা করেছিলেন এভাবে-“ভারত বিভাগ ও বঙ্গ বিভাগ ধ্বনি স্বাধীনতার ধ্বনি নয়, ইহা হতাশা, বিক্ষোভ ও মৃত্যুর আলিঙ্গন।’’

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশ দ্বিখণ্ডিত হল। দেশভাগের ফলে উৎপত্তি লাভ করল উদ্বাস্তু নামে এক নতুন সমস্যা। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল দেশভাগের মাধ্যমে। স্বাধীনতা ও দেশভাগকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। দেশভাগ হবে এমনটা অনুভব করে অনেক লেখক স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের একত্রিত করতে লিখেছিলেন- “ মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।’’ শুধু তাই নয়, “সর্বহারা’’ কাব্যের ‘কান্ডারি হুশিয়ার’ কবিতায় লিখেছিলেন -

“অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,

কান্ডারি! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ!

“হিন্দু না ওরা মুসলিম ?’’ ওই জিজ্ঞাসে কোন্‌ জন ?

কান্ডারি! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার!’’

বঙ্গ বিভাজনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিসত্ত্বার প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার বাঙালির অখন্ডতার জন্য গভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন –“বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান।’’ যাই হোক কবিগণের এসব প্রার্থনা থেকে মানুষ সরে এসে দ্বিখন্ডিত করল দেশ। ১৯৪৭ সালের এই বিভাজন রোধ করা যায়নি বললে ঠিক হবে না, বরং একটু স্বস্তির আশায় এই বিভাজন রোধ করতে চায়নি দুই বাঙালি।

স্বাধীনতা ভারতবাসীদের মধ্যে বয়ে এনেছিল অভূতপূর্ব আনন্দ, কিন্তু এই স্বাধীনতা বেশি দীর্ঘস্থায়ি হয়নি। স্বাধীনতা পেয়েও মানুষ আবার ব্রিটিশ শাসন কামনা করেছিল দেশভাগের পরেই। বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানরা সবথেকে বেশি দুঃখ যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছিল। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর সাধারণ মানুষের চরম দুর্গতির ছবি সবথেকে বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল বাংলা কথাসাহিত্য তথা বাংলা উপন্যাসে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এমন একটি শাখা যেখানে দেশভাগের মতো ভয়ানক ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে দেওয়া সম্ভব। বাংলা উপন্যাসে দেশভাগের প্রতিফলন এত পরিষ্কার যে, আমরা সেই সব উপন্যাস পড়েই ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ের মানুষের দুরাবস্থার কথা স্পষ্টতই অনুভব করতে পারি। এবারে একাধিক ঔপন্যাসিকের উপন্যাস তুলে ধরে চল্লিশের দশকের ভাঙ্গাগড়া ও বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিফলন নিয়ে আলোচনা করা যাক।

দেশভাগ ও দেশত্যাগের বিষয় কেন্দ্রিক বাংলা সার্থক উপন্যাস রচনা করেন অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। এই পর্যায়ে লেখা তাঁর তিনটি উপন্যাস হল – ‘ঠিকানা বদল’ (১৯৫০) ‘বেআইনি জনতা’ (১৯৫১) এবং ‘ভাঙছে শুধু ভাঙছে’ (১৯৫১)। এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে ‘ভাঙছে শুধু ভাঙছে’ উপন্যাসটি দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার সার্থক উপন্যাস। পূর্ববঙ্গের মানুষের গ্রাম্য জীবনযাত্রা, হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি, পুর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তু মানুষের ক্যাম্পে মনুষ্যেতর জীবনযাপন, এই সমস্ত ঘটনাবলী অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বর্নিত হয়েছে। লেখক এখানে কুসুমপুর গ্রামের এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত শশিশেখর ও তার পরিবারের দেশত্যাগের দুঃখময় কাহিনি বর্ননা করেছেন। দেশভাগের পুর্বেই সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দু অনুভব করেছিল ভয়ানক আশঙ্কা ও আতঙ্কের। ভেঙ্গে যাচ্ছে মানুষের ঐতিহ্যময় প্রাচীন সভ্যতা, ছাড়তে হচ্ছে পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি। হিন্দু ও মুসলমানদের যে মিলিত সংস্কৃতি তা মুহূর্তেই শিথিল হয়ে পড়েছে মন্দির থেকে মসজিত পর্যন্ত। ভগবান আর আল্লা যেন দুটি পৃথক সত্ত্বা হয়ে দাঁড়াল সাধারণ মানুষের কাছে। শুরু হল রাতের অন্ধকারে অপরিচিত স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা। হিন্দু ও মুসলমান ঐক্য কতটা দৃঢ ছিল তার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। কেননা সমস্ত হিন্দুরা যখন পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে তখন মন্নু শরিফের তেজস্বিনী মা ফতেমা উর্মিলাকে গোপনে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। যদিও এর পূর্বেই উর্মিলা মুসলমান দ্বারা সমস্ত কিছু লুণ্ঠিতা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে এসে শেয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় লাভ করে তারপর এক বাগান বাড়িতে। এই বাগান বাড়িতে মানুষের ভীড় দেখে মনে হয়েছিল এরা মানুষ নয়, ‘যেন পশুসব’। ধীরে ধীরে সকল ব্যথা ভুলার চেষ্টা করে। কিরণকে মনে জায়গা করে দিয়ে সহমর্মিতায় পরস্পর কাছাকাছি এসেছে।

শশিশেখরের স্মৃতিতে ধরা পড়ে সেই হিন্দু মুসলিমদের শান্তি ও আন্তরিক ভাবে একত্র বসবাসের কথা। মাধবী আর কিরণ ছিল গভীরভাবে প্রণয়ে আবদ্ধ। উর্মিলা ছিল শশিশেখরের পুত্রবধূ। দেশভাগের ফলে মাধবী কিরণের সম্পর্ক মুছে যায়, খুঁজে পায় ঊর্মিলা কিরণ নতুন পথ। এক সময় দুজনেই ক্যাম্প জীবন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। দেশভাগের ফলে হিন্দু নারীরা মুসলমান দ্বারা যেভাবে ধর্ষিতা হয়েছিল তা উর্মিলা কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। এর ফলে অন্তঃসত্বা অবস্থায় উর্মিলা আত্মহত্যা করে। এক দীর্ঘ হতাশার মধ্যদিয়ে এই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বাংলা ও পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের দুরাবস্থার কথা বর্ননা করতে লেখক বলেছেন-“ স্বাধীনতা এল, তবু ক্রন্দন হাহাকার ফুরাল না, কাঁদছে বাংলা ও পাঞ্জাব।

লেখক নিজেও দেশভাগের পর বহুদিন উদ্বাস্তু হয়ে ব্যারাকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর উপন্যাসে দেশভাগ ও তার পরবর্তী ফলাফল অধিক পরিমানে জীবন্ত হয়েছে। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে লেখক ‘ঠিকানা বদল’ ও ‘বেআইনি জনতা’ নামে আরও দুখানি উপন্যাস লিখেছেন। ‘ঠিকানা বদল’ উপন্যাসে আছে অসহায় নারী অহল্যার কাহিনি যে কিনা দেশভাগের সময় পঙ্গু স্বামীকে সঙ্গে আনতে না পেরে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সত্য বন্ধুর সঙ্গে সহমর্মিতায় যখন অহল্যার অন্তরঙ্গতা বেড়ে যায় তখন পঙ্গু স্বামী সুস্থ হয়ে অহল্যার সন্ধান পায়। অহল্যা ফিরে যায় স্বামীর সঙ্গে। অহল্যার আবার ঠিকানা বদল ঘটে। এই উপন্যাসের মূল বিষয় হল সর্বহারা মানুষের আশ্রয়ের সন্ধানে বারবার ঠিকানা বদল। আবার ‘বেআইনি জনতা’ উপন্যাসে দেখা যায় সংখ্যালঘু হিন্দু ও মুসলমানদের দেশত্যাগের ফলে স্থায়ী আশ্রয় সন্ধান করতে। মাথা গোজার জন্য সাধারণ মানুষ রায় সাহেবের জমি দখল নেয়। আবার এক সময় এই বস্তিজমি ছেড়ে দিতেও বাধ্য হয়। লেখক এখানকার বস্তিজীবনের জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। দরিদ্র বস্তির মেয়ে কুলসুম ও আমিরণ পেটের জ্বালা মেটাতে আশ্রয় নেয় পতিতা পল্লীতে। এই উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে হিন্দু ও মুসলমানদের একত্র মিলিত সংগ্রামের কাহিনি। পশ্চিমবঙ্গ বাসীদের কাছে এই অসহায় মানুষগুলোর কোন মূল্য ছিল না। তাদের খাদ্যবস্ত্রের নূনতম অধিকার কেউ দিতে রাজি ছিল না। ফলে শহরের সর্বত্র এরা কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াত আজ এখানে তো কাল ওখানে।

রমেশ্চন্দ্র সেন প্রাক্‌ স্বাধীনতার সময়, স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগ ও দেশত্যাগের ফলে উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প জীবন ও পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ স্থাপনের বিশ্বাস্য বিবরণ তুলে ধরেছেন। দেশভাগের পূর্বের ঘটনাবলীতে দেখা যায় মূল চরিত্র উমা আর নির্মল। আবার উমাকে বিয়ে করতে চায় মুসলমান যুবক আখতার। আখতারের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হলে গুজব রটে দাঙ্গার। নারীদের সম্ভ্রমের কথা ভেবেই হিন্দুরা দেশত্যাগ করে পাড়ি দেয় অজানা অচেনা ভারতের বুকে। দেশত্যাগ করার সময় সীমান্তে তল্লাশি চালিয়ে পাকিস্থানের পুলিশরা সাধারণ মানুষকে সর্বশান্ত করে দেয়। কেউ যদি বা স্বল্প কিছু ধনসম্পদ নিয়ে আসে সেটাও হজম করে পশ্চিমবঙ্গের এক শ্রেণীর দালাল ক্যাম্পে আশ্রয় দেবার লোভ দেখিয়ে। শুধু তাই নয়, দেশত্যাগের সময় সীমান্তে এবং ভারতের বুকে আশ্রয় নেওয়ার পরেও দুশ্চরিত্র পুরুষদের শিকারে পরিণত হয় অল্প বয়সের অনেক মেয়েরা।

দেশভাগ ও দেশত্যাগের বর্ননা দিতেই অজিত দাস লিখেছেন ‘ভাগফল’ (১৯৫৬) উপন্যাস। এই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে চন্দনপুর উদ্বাস্তু শিবির থেকে। অসহায় মানুষদের সাহায্য করতে একটি দলগঠিত হয়েছিল। সরকারি সাহায্য বন্টনের অজুহাতে শিবিরে একদল মানুষ সুবিধাভোগী হয়ে উঠল। সরকারে কাঁচা টাকা পেয়ে তারা মহিলাদের জন্য আটহাত কাপড় কিনল যা মাথায় ঘোমটা দিতে গেলে পিঠ ঢাকে না, আবার হাটু পর্যন্ত নামে মাত্র। ক্যাম্পে চিকিৎসার অভাব, অন্নবস্ত্রের অভাব, এসব থেকে মুক্তির পথ খুঁজতেই সৃষ্টি হল প্রতিবাদী শক্তির। এই প্রতিবাদের নেতৃত্ব দেয় শ্যামলী যার সঙ্গে চন্দনপুরের কিষান সভাও হাত মিলিয়ে ছিল। কিষান সভায় কিছু মুসলমান থাকায় উদ্বাস্তু আন্দোলনের উপর সাম্প্রদায়িক রঙ চড়ানোর চেষ্টা হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তু মানুষেরাই জয়লাভ করে।

অমিয়ভূষণ মজুমদার ডাক বিভাগের চাকরি করাকালীন হাতে তুলে নেন কাগজ আর কলম। খুব অল্প বয়সেই লেখক ও তাঁদের পরিবার দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচতে পাবনা ছেড়ে কোচবিহারে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাবনার সমস্ত সম্পত্তি ছেড়ে প্রায় উদ্বাস্তু হয়েই তারা জীবনযাপন করেছিলেন। প্রাক্‌ স্বাধীনতা ও তার পরবর্তী কালের দেশভাগ ও দেশত্যাগের দলিল রচনা করলেন ‘গড় শ্রীখন্ড’ (১৯৫৭) ও ‘নির্বাস’ (১৯৫৯) এই দুটি উপন্যাসে। ‘গড় শ্রীখন্ড’ উপন্যাসে দেশত্যাগের ঘটনাবলী তেমন স্পষ্ট নয়, কিন্তু তার পূর্ববর্তী সময়ে যখন থেকে হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কের বাঁধন ঢিলে হতে থাকে। কৃষক রামচন্দ্র মণ্ডল এক সময় মনে করত ছমিরের মতো বন্ধু তার পাশে থাকলে সে গোটা পৃথিবীটাকেই চষে ফেলবে। কিন্তু দেশভাগের হাওয়া যখন বইতে শুরু করল তখন সেই প্রিয় বন্ধু ছমির রামচন্দ্রের জমি দখলের পরিকল্পনা খুঁজে বেড়ায়। রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে-“ ওপারে কবে যাবা ?” আলেফ শেখের ছেলে কোলকাতায় ডাক্তারি পড়তে গিয়ে মারা যায়। এর ফলে গ্রামের মানুষও বিচলিত হয়ে পড়ে। না হিন্দু না মুসলমান কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কেষ্টদাসের মুখে রামচন্দ্র শুনতে পেল দেশভাগ হচ্ছে-

‘শুনছেন মণ্ডল, দেশ বলে ভাগ হতিছে’ ?

‘সে আবার কী’ ?

‘হয়! এক ভাগ হিঁদুর, আর এক ভাগ মোসলমানের’।

এবার যেন রামচন্দ্রের স্বপ্ন ভঙ্গ হল। দেশভাগ হলে কোথায় যাবে এত মানুষ ? সে দ্রুত পায়ে জমিদার সান্যালের বাড়িতে গেল। তখন জমিদার বাড়ির সকলেই পালিয়েছে নায়েব ছাড়া। রামচন্দ্রকে দেখেই নায়েব বলেছে- “ তুমিও বুঝি সেই খবরটাই চাও ? অনেকেই জিজ্ঞাসা করছে। ... দেশভাগের কথা শুনলে রামচন্দ্র ? ... চৌহদ্দিটা ঠিক কী হল বুঝতে পারছি না।’’ রামচন্দ্রের মত দুঃসাহসী মানুষও যেন এক মুহূর্তে সাহস হারিয়ে ফেলে। রামচন্দ্র পাগলের মত চিৎকার করে বলেছে- “ জমি তো মেলা দেখি, কিন্তু চাষা কই ?’’

এই উপন্যাসে আরও একটি শ্রেণী আছে যারা দেশভাগের আগে থেকেই উদ্বাস্তু হয়ে জীবনযাপন করছে। সুরতুন্নেছা, ফতেমা, ফুলটুসি, টেপি, টেপির মা, গোঁসাই এবং মাধাই বায়েন । চরিত্রগত দিক থেকে এরা প্রায় সকলেই জীবিকার টানে চোরাই পথে চালের ব্যবসা করে। এই চালের ব্যবসা তাদের দুবেলা খাবারের আয়োজন করে দিলেও অনেকেই এই ব্যবসা করতে গিয়ে রেলে কাটা পড়েছে। আবার চালের ব্যবসা বন্ধ করে টেপি ধরেছে দেহ ব্যবসা। কোন চরিত্রই যেন স্থির নয়, প্রয়োজনের সাথে সাথে সকলের ক্রিয়াকলাপেরও পরিবর্তন ঘটেছে এই উপন্যাসে। পদ্মানদীর মাধ্যমেই লেখক সাধারণ মানুষের জীবনের পরিবর্তনকে যেন তুলে ধরেছেন।

‘নির্বাস’ উপন্যাসটি দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পর যখন মানুষ অচেনা স্থানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে সেই সময়ের দুরাবস্থার ইতিহাস মাত্র। দেশভাগ হলে রাতের অন্ধকারে পালানোর সময় দিদির মৃত্যু হলে জামাই বাবুর হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে এসে আশ্রয় লাভ করে বিমলা। পালিয়ে আসার সময় একদল লোভী মানুষের শিকার হয়ে মুসলমানদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিল। সৌম্যর সাহায্যে বিমলা একটা চাকরি পেয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক কারনে সেটাও হাত ছাড়া হয়ে যায়। বিমলার দেহ দেওয়ার শর্তে বৃদ্ধ বড়বাবু আবার চাকরি দিতে চেয়েছিল। বিমলা যেন জীবনের কিছুই বুঝতে পারছে না। উত্তরবঙ্গের হলুদমোহন ক্যাম্প ছেড়ে সবাই যখন দন্ডকারণ্যে চলে যায় তখন তাদের প্রতিবাদ শ্লোগানে নয়, বরং কান্না আর উলুধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। বিমলা মালতীকে একদিন বলেছে – “ আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো, আমরা পৃথিবীর কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাজনীতির সুতো টানছে কেউ আর আমরা হাত পা ছুঁড়ছি। ভাবছি সেটাই বাঁচা। ’’ মরণচাঁদ, সৌদামনি, মোহিতবাবু, অজয় এদের আরও ভয়ানক অবস্থা লেখক স্বল্প আঁচরে বৃহৎ করে তুলেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের দুঃখময় করুণ কাহিনি ফুটিয়ে তুলতে বাংলা ঔপন্যাসিক অসীম রায়ের নাম স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করতে হয়। দেশভাগ ও দেশত্যাগের উপরে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস হল ‘শব্দের খাঁচায়’ (১৯৬৮)। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও শহরে মানুষের সমান প্রভাব পড়েছিল। এই সময়ের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার টুকরো ছবি এই উপন্যাসে সুচারুভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দেশভাগের পর যে আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি মানুষের মনকে বিষিয়ে দিয়েছিল। মানুষ শক্ত করে বেঁচে থাকার হাল ধরার চেষ্টা করলেও সঠিক মানুষ হয়ে ওঠতে পারেনি।

দেশভাগের প্টভুমিকায় সমরেশ বসুর ‘খন্ডিতা’ (১৯৮৭) উপন্যাসটির নাম অবশ্যই করতে হয়। এই উপন্যাসের কাহিনি ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের ঘটনাবলী নিয়ে। গঙ্গা আর রেল লাইনের মাঝে নৈহাটি শিল্পাঞ্চলের তিনশ্রেণীর পরিবার থেকে আসা তিনবন্ধুই মনে করে তাদের স্বাধীনতা অনেক অপেক্ষার পর এলেও তা এল খন্ডিতা হয়ে। একজন পুরুষ স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য নারীর সঙ্গে রাত কাটিয়ে স্ত্রীর কাছে ফিরে আসার যে অপমান, ভারতের স্বাধীনতাও যেন সাধারণ মানুষের কাছে তেমনটাই অপমানের।

নারায়ণ সান্যালের ‘ বকুলতলা ক্যাম্প ’ (১৯৭৮) ও ‘বাল্মীক’ (১৯৮৩) উপন্যাস দুটিও দেশভাগ ও দেশত্যাগের ঘটনায় মুখরিত হয়েছে। ক্যাম্প জীবনে মানুষ গুলোর জীবন যেন অস্থির। গলায় তুলসির কণ্ঠি, সৌম্য মাংসল মূর্তি, ধুরন্ধর ডাক্তারবাবু, অসৎ কন্ট্রাক্টর সিংজি, চরিত্রহীন উদ্বাস্তু খোকা প্রভৃতি চরিত্রের নীচতা, শঠতা, উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ সরকারি ত্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এবং তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি ঋতব্রতর প্রতিবাদ ও সফলতা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ‘বাল্মীক’ উপন্যাসে আছে জীবন যুদ্ধের সঙ্গে কঠিন জীবন যন্ত্রনা। হরিপদ মাস্টার তার পরিবারকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। নানা ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে স্থান পায় শরনার্থীদের ক্যাম্পে। কিন্তু পরিবারে নেমে আসে চরম ট্র্যাজেডি। রিকশা চালাতে চালাতে বড় ছেলে অনিমেষ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। ছোটভাই ট্রেনে হকার হয়ে যায়। ব্যক্তি জীবনের নানা অসংগতি লেখক মিলিয়ে দেন ক্যাম্প জীবনের নানা অসৎ বৃত্তির সঙ্গে। হরিপদ মাস্টারের মেয়ে নমিতা জীবন যুদ্ধে নামে, প্রতিবাদ করতে গিয়ে এক সময় পুলিশের গুলিতে মারা যায়। নারায়ণ সান্যাল পেশাগত ভাবে ছিলেন বাস্তুকার। তাই তিনি মানুষের উদ্বাস্তু জীবনকে খুব কাছের থেকে লক্ষ্য করেছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, দেশভাগ ও দেশত্যাগ নিয়ে অনেক ঔপন্যাসিক তাঁদের কলমের খোঁচায় অনেক বাস্তব জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। এই স্বল্প পরিসরে বাংলা সাহিত্যের এই জাতীয় সমস্ত উপন্যাসের আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই জাতীয় কিছু উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা হল মাত্র। যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অর্জুন’ (১৯৭১) ও ‘ পূর্ব পশ্চিম’ (১৯৮৮)। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ (১৯৭১) ‘মানুষের ঘরবাড়ি’(১৯৭৮)। প্রফুল্ল রায়ের ‘কেয়া পাতার নৌকা’ (১৯৯৬) ‘ভাগাভাগি’ (২০০১)। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘উজান’ ১৩৭৮), কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের ‘উজান তলীর উপকথা’ (২০০০), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘লাল মাটি’ (১৯৫১), জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘ এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ (১৯৬৮), শান্তা সেনের ‘ পিতামহী’ (১৯৯৪) ‘জন্মের মাটি’ (২০০৭), ও ‘ সুপারি বনের সারি’ (১৯৯০), সাবিত্রী রায়ের ‘সৃজন’ (১৯৪৬), ‘ত্রিস্রোত’ (১৯৪০) ও ‘স্বরলিপি’ (১৯৫২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

আলোচনার শেষে বলতে হয় যে, ভারতবাসী তাদের স্বাধীনতা চল্লিশের দশকে আশা করেছিল একথা সত্যি, কিন্তু তার সাথে যা ঘটল সেটা কেউ আশা করেনি নিশ্চয়। চল্লিশের দশকে একদিকে ভারতবাসী পরাধীনতার মুক্তি লাভ করল অপর দিকে তেমনি আবার দীর্ঘকাল একসাথে বসবাস করা দুটি সম্প্রদায় চির শত্রুতে পরিণত হল। হাজার হাজার হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে পাকিস্থান থেকে ভারতে আর মুসলিম উদ্বাস্তু হয়ে ভারত ছেড়ে পাকিস্থানে চলে গিয়েছিল। ভারতের ব্রিটিশ মুক্তির জন্য বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান এক সাথে দীর্ঘকাল লড়াই করেছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। এই সময় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মিত্রতা যতটা ছিল, দেশভাগ হলে উভয়ে ততটাই শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। এই সময়কার ঘটনাবলী বাংলা উপন্যাসের জন্য বিশালাকারে তথ্য বয়ে এনেছিল। আমরা বলে থাকি উপন্যাস বাস্তব জীবনের দর্পণ। ফলে চল্লিশের দশকের বাস্তব ঘটনাবলী স্থান লাভ করেছে বাংলা উপন্যাসের শাখায়। অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসে চল্লিশের দশকের পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে বলা যায়।

তথ্যসূত্রঃ

১। সরকার, তারক, বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ, অরুণা প্রকাশনী, ২০০৯।

২। কুন্ডু, চন্দন কুমার, চল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২০১২।

৩। চক্রবর্তী, ড, শঙ্কর প্রসাদ, বাংলা উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তিমপর্ব, করুণা প্রকাশনী, ২০০৬।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়), চিত্রিতা, সময়ের উপকরণ মেয়েদের স্মৃতিকথা, পুস্তক বিপণি, ২০০৪।

৫। সেনগুপ্ত, নীতিশ, বঙ্গভূমি ও বাঙালির ইতিহাস, দেজ পাবলিশিং, ২০০৪।

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, ২০০৫.

যামিনী রায় এক ভুবনশিল্পী......

আশীষ কুমার সাউ

কোনও কোনও শিল্পীর সৃজনকলায় এমন এক বিশেষ স্বকীয়তার ছাপ থাকে যা দেখে অভ্রান্ত ভাবে সেই স্রষ্টাকে সনাক্ত করা যায় এবং সেই সনাক্তকারী চিহ্নগুলি তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয় – ছবিতে কোনো স্বাক্ষর না থাকলেও আমরা সেই লক্ষণগুলিকে শিল্পীর ‘সিগনেচার’ (স্বাক্ষর) বলে থাকি। ভারতীয় চিত্রকলায় শিল্পী যামিনী রায়ের স্বকীয়তা তেমনই এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। মোটা তুলির টানে গাঢ় জলরঙের ব্যবহার, শিল্পীত বিষয়ের আকৃতি এবং ভঙ্গিমা, বিশেষ করে মুখের আয়তন ছাপিয়ে আকর্ণ বিস্তৃত চোখের বিন্যাস যামিনী রায়ের রচনার এক অনন্য ঐশ্বর্য।

যামিনী রায়-এর ( জন্মঃ ১৮৮৭ ) শিল্পী-জীবনের সূচনা পর্ব ভারতীয় চিত্রকলায় দুটি প্রধান ধারার একটি ছিল ইউরোপীয় শিল্পীরীতির ধারা আর অন্যটি হল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত এক নতুনধারা যা ইউরোপীয় রীতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। যামিনী রায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব ( মৃত্যুঃ ১৯৭২ ) পর্যন্ত এই দুই ধারাকেই অনুকরণ না করে তাঁর স্বকীয় অনুভাবনায় এক নিজস্ব ধারাকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে খুঁজে নিয়েছিলেন। লোকজীবন থেকে উঠে আসা সেই মৌলিক উদ্ভাবনশীলতা সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলাকে বিশ্বের পরিমন্ডলের এক নতুন দিগন্তের দরজা খুলে দিয়েছিল বললে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি হয় না।

যামিনী রায়ের জন্ম বাংলায় বাঁকুড়া জেলার অখ্যাত বেলিয়াতোড় গ্রামে। গ্রামের পাঠশালায় লেখা পড়া শুরু হয়েছিল। বাড়ির কাছেই পটুয়াপাড়া, পাঠশালার পাঠ শেষ হতে না হতেই বাকিরা যখন মাঠে, ঘাটে, পুকুরে, দীঘিতে, আমবাগানে হাডুডু, খোখো নিয়ে মেতে উঠেছে তখন সে ছেলে পটুয়াদের পটআঁকা দেখছে একমনে। কুমোর পাড়ায় প্রতিমা শিল্পীদের হাতে মাটির মূর্তি কিভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তা দেখছে একমনে। ওদের মাটি নিয়ে পুতুল, ঘোড়া বানানোর কী চেষ্টাই না করছে !

বাবা,রামতারণ রায় নিজেও যে ছোটবেলা থেকে রঙের গুঁড়ো দিয়ে ছবি আঁকতেন। সেই ছোট্ট বেলার অভ্যাস। ছেলেও পেল সেটা। মা নগেন্দ্রবালা একটু চিন্তিত হলেন। জমিদার বাড়ির ছেলে ( যদিও তালপুকুরে ঘটি ডোবে না ) শেষে কী-না পটুয়া হবে? নাকি মৃৎশিল্পী? বাবা ভাবলেন ছেলে তো তাঁর অভ্যাস পাবেই। স্বামী স্ত্রীতে কথা হল। ওর যা ভালো লাগে তাই করুক। শিল্পীদের হয়তো পয়সা কড়ি তেমন থাকে না। তা বলে পয়সাটাই কি সব? দেশে বিদেশের সুনাম, মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসা? এসবের কি কোন দাম নেই? মা বাবা ছেলের প্রতিভাকেই আরো বিকশিত করতে চাইলেন। ছবি আঁকা শিখতে ছেলে চলল কলকাতায় মামার বাড়ি। তখন তার বয়স ষোলো।

মামাবাড়ি থেকে উদ্যোগ নিয়ে ছেলেকে ভর্তি করা হল কলকাতা আর্টস্কুলে। গিলার্ডি সাহেব পাশ্চাত্য রীতিতে তেল রং এর সাহায্যে তাঁকে ছবি আঁকা শেখানো শুরু করে নিলেন। সে ছেলে তো প্রতিভাধর। সহজে শিখে নেয়, বুঝে ফেলে, চটপট করে ফেলে। ভগবান দত্ত ক্ষমতা। গিলার্ডি সাহেব মুগ্ধ। তাকে যে কোনো ক্লাসে যে কোনো স্তরের ছবি আঁকার পাঠ গ্রহণে অনুমতি দিলেন। ছেলে অবশ্য নিয়মিত স্কুলের ক্লাস করত না। মাসে মাসে স্কুলের খাতায় নামও থাকতো না। খামখেয়ালি বলে স্কুলের পাঠক্রম শেষ পর্যন্ত শেষ করতে বেশকয়েক বছর লেগেছিল।

১৯০৬ সালের বাঁকুড়ার জেলাশাসক তাঁকে একটি গিনি পুরস্কার স্বরূপ উপহার দিলেন। ‘সমাজ’ শীর্ষক একটি ছবির জন্য ঐ পুরস্কার। এখন থেকে আর তাঁকে ছেলে না বলে আমরা শিল্পী যামিনী রায় হিসেবে মর্যাদা দেব। তা শিল্পী তখন ইউরোপের ঘরানায় ছবি আঁকছেন। মডেল বসিয়ে জীবন্ত ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। শিল্পী যামিনী রায়ের কথা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানতে পারলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রতিকৃতি তিনি যামিনী রায়কে দিয়ে করিয়েছিলেন।

এরপর তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হলেন। পাশ্চাত্য রীতির প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকে তিনি খ্যাতি অর্থ সবই পেলেন। নাম ছড়িয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে বিবাহ করেছেন। স্ত্রী আনন্দময়ীকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। কয়েকজন শিল্পী মিলে ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব আর্ট নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তাঁর ছবির একটা নিজস্ব মঞ্চ তৈরি হল।

মানব, দৃশ্য, প্রতিকৃতি, নিসর্গ দৃশ্য অঙ্কনে খ্যাতি যশ অর্থ সবই পাচ্ছেন। কিন্তু যে অর্থে তিনি আজকের যামিনী রায়, ভারতীয় ঘরনার বিশ্ববিখ্যাত মৌলিক শিল্পী সেই অর্থে ঐ অঙ্কন পদ্ধতি তাঁকে শান্তি দিতে পারছিল না। এতো অনুকরণ! মৌলিক প্রতিভা তো নয়। এতো তাঁকে সর্বকালীন খ্যাতি এনে দিতে পারে না। বয়স যখন চৌতিরিশ তখন থেকে এই বোধ তাঁকে কুরে কুরে খেতে লাগল। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। পাশ্চাত্য রীতি ছেড়ে ভারতীয় ঘরনা-তবু শান্তি পেলেন না। পয়সার জন্যে ছবি আঁকতে চাইছেন না-আপোষ নয়-লড়াই। খেতে পারছেন না, ঘুমতেও পারছেন না, অভাব অনটন, দুঃখ কষ্ট-কাপড়ের দোকানের কাজ, ছাপাখানার চাকরি-মানে কোনও রকমে দুটো পেট চালানো।

তারপর একদিন হঠাৎই শৈশবে ফিরলেন। নেহাতই নস্টালজিয়া। তবু সন্ধান পেলেন মাটির সোঁদা গন্ধ। লোকশিল্প-সহজ সরল জীবনের ছবি আঁকবেন। ছোটবেলায় ঐ সুর ছন্দ গন্ধ স্পর্শেই তো শিল্পের শব্দগুলি শেখা। লোকজীবন, লোকসংস্কৃতি ও লোকচিত্রেই তিনি তাঁর প্রতিভায় সার্থকতা আবিস্কার করলেন। শহর, নগর, কৃত্রিমতা বাদ দিয়ে গ্রামীণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট হলেন তিনি। মেকি সভ্যতার কৃত্রিম, ফাঁকা সত্তা নয়,তিনি চাইলেন মাটির দাওয়ায় কাঁসার থালা পেতে কাঁসার গ্লাসে জল খেতে। নিদেন পক্ষে কলাপাতায়। আর শুতে চাইলেন শীতলপাটি বিছিয়ে। ফিরে যেতে চাইলেন বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামের সেই অতি সাধারণ জমিদার বাড়ির উঠোনে, দাওয়ায়। লোক শিল্পের সরলতার মধ্যেই তিনি নিজের প্রতিভার মৌলিক মুখটা দেখতে পেলেন। ১৯৩৪-এ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে তার উত্তরা অভিমন্যু ছবিটি ভাইসরয়ের স্বর্ণপদক লাভ করল। ১৯৩৭ অধ্যাপক শাহিদ সুরাওয়ার্দি তাঁর কাজের প্রশংসা করলেন।

ঘটনাচক্র তাঁকে কিছুটা সাহায্য করল। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে কলকাতায় এসেছে ইংরাজ ও আমেরিকান সৈন্য। তাদের মধ্যে চিত্র রসিকরা যামিনী রায়ের ছবি কিনে দেশে ফিরল স্মারক হিসেবে সংগ্রহ বাড়াবে বলে। বি নিকলস লিখলেন ‘ভার্ডিক্ট অন ইণ্ডিয়া’ গ্রন্থ। সেখানে শিল্পীর প্রশংসা সকলের চোখে পড়ল। বিদেশিরা ছবি দেখল, শিল্পীর কথা পড়ল-সমঝদার যারা তারা তাঁর ছবির কথা প্রচার করতে লাগল। তবে হ্যা, বিদেশিরাই আমাদের দেশের সম্পদ, ঐতিহ্য, ঐশ্বর্য্যকে আবিস্কার করেছে। তাদের বিচক্ষনতায় সেইসব কৃতিত্ব, দক্ষতা সকলের চোখের সামনে এসেছে। এদেশ বিদেশিদের শংসাপত্র ছাড়া সহজে কাউকে কৃতিত্ব দিতে চায় নি। যামিনী রায়ের ক্ষেত্রেও তেমনটা ঘটেছিল সন্দেহ নেই।

১৯৪৮-এ বালিগঞ্জ প্লেস ইষ্টে নিজস্ব বাড়ি করলেন। দোতালা বাড়ি। তলায় ছবি আঁকার ঘর ও ছবির গ্যালারি। ছবি রাখার ঘর সেজে উঠল নানা রঙের পুতুল দিয়ে। ওপর তলায় তিনি থাকবেন আনন্দময়ীর সঙ্গে। সত্যিই তিনি আনন্দময়ী। দুঃখের দিনগুলোকে তিনি কী আনন্দময় করে রেখেছিলেন! অভাব দারিদ্র কষ্ট যন্ত্রণা স্বামীকে বুঝতে দেননি কখনও। তাহলে তো শিল্পীর সাধনায় ছেদ পড়বে, বাধা আসবে। সংসারটা আগলে ছিলেন বুক দিয়ে বলেই শিল্পীর ছবি আঁকা কোনোদিন বন্ধ হয়নি।

কবি বিষ্ণু দে খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন যামিনী রায়ের। তাঁর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে যামিনী রায় এমন এক সর্বগ্রাসী শিল্প-আঙ্গিক (টোটালিটারিয়ান ফর্ম) খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন যার মাধ্যমে তিনি তাঁর শিল্প-ভাবনার সমস্ত আঙ্গিককে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। তাঁর শিল্পজীবনের প্রারম্ভিক পর্বে আমরা দেখি তিনি সাদামাটা ভাবে রঙের ব্যবহার করতেন, সেখানে আলো-ছায়ার কোনও তারতম্য বুঝতে পারা যেত না। ছেলেবেলায় যে গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে তার নিবিড়ভাবে পরিচয় ছিল সেই গ্রামের নিসর্গ চিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে,তিনি রেখার ব্যবহার অত্যন্ত পরিমিতি ভাবে করতেন। ক্রমশ তাঁর অঙ্কন শৈলী পরিণত হয়ে উঠতে থাকে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য হল তাঁর ছবিতে আলোছায়ার বৈচিত্র্য দেখা যায় না, সে ক্ষেত্রে তাঁর ক্যানভাস কিছুটা ফ্ল্যাট এবং মাত্রাহীন (ডাইমেনশান লেস)। রেখার (লাইন) ব্যবহার সে কারণে তাঁর ছবিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর এই সহজ সরল অঙ্কন-রীতিতে যামিনী রায় পুরোপুরিভাবে পশ্চিমী রীতির শিল্পশৈলী থেকে বেরিয়ে আসেন। এটা বিশ্‌ শতকের তিরিশের দশকের কাল খণ্ড এবং এই সময়েই যামিনী রায় একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব শিল্পরীতিটি খুঁজে পেয়েছিলেন যেটাকে তাঁর সিগনেচার-স্টাইল হিসেবে পরবর্তীকালে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর এই অঙ্কন শৈলীর মধ্যে ভারতীয় লোকশিল্পের ধারাটি (ফোক-আর্ট) নতুন মাত্রা লাভ করে। তাঁর ছবির মধ্যে প্রাচীন বাংলার পটচিত্র, পুতুল, খেলনা এবং বিষ্ণুপুরের মন্দির-স্থাপত্যের টেরাকোটা মূর্তির আঙ্গিক ফুটে উঠতে থাকে।

যামিনী রায়ের ছবির বিষয়বস্তুতে পুরাণের দেবদেবীদের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি, যীশুখ্রিষ্টের জীবন এবং সেই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন যাপনকথা, পাখি আর গৃহপালিত পশুদের উপস্থিতি। তিনি একাধিক রঙের মিশ্রণ না করে, প্রধানত মূল সাতটি রঙ ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন এবং গ্রাম্য পটুয়াদের মতো সনাতন পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে রঙ তৈরি করার পক্ষপাতি ছিলেন। রঙিন মাটি সংগ্রহ করে তার থেকে ছাই-রঙ, নানান ধরনের পাথর গুঁড়ো করে লাল ও হলুদ রঙ, নীলগাছ থেকে নীল-রঙ এবং লম্ফর ভূষো থেকে কালো-রঙ তৈরি করতেন। প্রথমের দিকে বাইন্ডার হিসেবে সাবুদানার মতো এক ধরনের শ্বেতসার বীজ গুঁড়ো করে (ট্যাপিওকা সীড) গঁদ তৈরি করতেন। কিন্তু শুকিয়ে যাবার পর তা ছবিতে একটা কালচে আভাষ ফেলত বলে পরবর্তীকালে আকাশমণি (রবীন্দ্রনাথ যাকে ‘সোনাঝুরি’ নাম দিয়েছিলেন) গাছের রস ব্যবহার করতেন। ক্যানভাসের ‘জমি’ (গ্রাউণ্ড বা বেস) তৈরি করার জন্য মিহিকাপড়ে ছাঁকা গোবরের গুঁড়ো জলে হালকা করে লাগাতেন এবং গোবরকে শুকনো করে কাপড়ে ছেঁকে প্রয়োজন মতো পাউডার তৈরি করার কাজটিও নিজের হাতে করতেন। এই দেশজ রঙ ও ‘জমি’ তৈরি করার মতো রঙ করা বা আঁকবার তুলিও তিনি নিজেই বানাতেন। কাঠির মাথায় সরু বা মোটা করে তুলো অথবা পাট জড়িয়ে তাঁর এই নতুন রীতির অঙ্কন-শৈলীর জন্য উপযুক্ত তুলি তিনি নিজেই তৈরি করে নিতেন। একেবারে শেষ বয়সের দিকে শারীরিক অক্ষমতার কারণে তিনি পাড়ার দোকান থেকে রঙ-তুলি কিনে ব্যবহার করলেও সেইসব শৌখিন তুলি-ব্রাশের বদলেও তাঁর অঙ্কন-শৈলীতে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

ছবিগুলো যেন কথা বলে। খুব নাটকীয় মানবিক, পরিশুদ্ধ, ক্ষেত্রজ-চিত্রীর গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফল। ছবি ভরে এল নগণ্য মানুষঃ কামার, কুমোর, চাষি, ছুতোর, বাউল, জেলে, মাঝি। রেখাচিত্রে অসামান্য হয়ে উঠল দুই বেড়াল, চিংড়ি মুখে বেড়াল কালো বেড়াল। গরু, ঘোড়া, বাঘ, হরিণ, সাঁওতাল, পুরুষ ও রমণী, পৌরাণিক চরিত্র-অনায়াস সহজ, সরলভাবে তাঁর ছবিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর ছবির বিষয় নিয়ে আরও দু-চার কথা। বিখ্যাত ছবিগুলি হলঃ কৃষ্ণ বলরাম, গণেশ, জননী, যশোদা, বুদ্ধদেব, মীরার অগ্নিপরীক্ষা, রাধাকৃষ্ণ, স্ত্রীলোক সাঁওতাল রমণী, ক্রুশবিদ্ধ যীশু, মায়ের কোলে শিশু, হাতির পিঠে রাজা, লাল ঘোড়া, বাংলার বধূ, গরু, দুই বৈষ্ণব, তিন যোদ্ধার চিত্র রথের ওপর রাজা রাণী, সাঁওতালের মাথা। লোকজীবন, অরণ্যজীবন, পুরাণ, ঘরোয়া পরিবেশ সবকিছুই আপাত দৃষ্টিতে পট (কালীঘাট বা বাঁকুড়ার) চিত্র হিসেবে প্রতিভাত হলেও তা মহান চিত্রসৃষ্টি সন্দেহ নেই। খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর আঁকা যীশুর চিত্রমালা অসাধারণ। তাঁর ছবির কারিগরিতে রয়েছে ভারতীয় সাঁওতাল জীবন ও শিল্পরীতির অনুসরণ, লাইন ড্রইং, ফ্ল্যাট টেকনিক, অলংকৃত আলপনা, নতুন রীতির দ্বিমাত্রিক ছবি, ডাকের কাজের ছবি। তাঁর আলপনা ও ডাকের সাজ একসময় বাংলার রঙ্গমঞ্চকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল।

এই স্বনামধন্য শিল্পী নিজেই নিজের শিল্পকে গড়েছেন, আবার শিল্পীমনের সৃষ্টি সুখের প্রবল তাগিদে যাত্রা করেছেন নতুন ধারায়। প্রথমদিকে ফ্ল্যাট টেকনিকে আঁকা ইউরোপীয় ঘরনার ছবি, তারপর বঙ্গভূমের লোকসংস্কৃতি ও লোকাচারের চালচিত্র। খ্যাতির শীর্ষে থাকতেই তাঁর অন্তরে শিশুমনের উন্মেষ- আরো সহজ ও সরল চিত্ররীতি, নতুন করে আঁকা হোল জন্তু-জানোয়ারের ছবি, শিকার ও নাচের ছবি। আবার এরপরই সুউচ্চ তুষারশৃঙ্গসম শিল্পীসত্তার ঊর্দ্ধগমন, সরল আঙ্গিকের রিক্ততায় বুঝি ক্লান্ত শিল্পী ফিরলেন বর্ণবাহুল্যে-রেখা ও রঙের অভিজাত সমৃদ্ধ;- ‘পূজারিণী মেয়ে’, ‘কীর্তন’ এবং ‘বাউল’–এ পর্যায়ের সৃষ্টি কৃষ্ণলীলা, রামায়ন, মহাভারত ও রূপকথার ছবিতে অলঙ্কারের কারুকার্য এবং রঙের অসামান্য ব্যবহার চিরকাল আমাদের মুগ্ধ করবে। এরপরই রঙের জৌলুষ ছেড়ে প্রাণবন্ত উদ্দাম রূপকল্পনা শিল্পীর তুলিতে বাসা বাঁধলে। শুরু হলো ডট্‌ বা ফুট্‌কি দিয়ে আঁকা- ‘ম্যাডোনা’, ‘বিড়াল ও চিংড়িমাছ’ –ইত্যাদি ছবি এই পর্যায়ের শিল্পকৃতির স্বাক্ষর বহন করছে।

অশান্ত শিল্পী এরপর মনোনিবেশ করলেন লোকগাঁথা ও পুরাণে। ‘মহাদেব’, ‘বাঘের পিঠে রাজা’ এ পর্যায়ের ছবি।

মৃত্যুর আগে তার শেষ ছবি ‘লাস্টসাপার’, কাজটি অসমাপ্ত, যদিও এর আগে তিনি এই ছবিটি এঁকেছিলেন ১৯৪২- এ কিন্তু শেষ কাজটি ছিল বৃহদাকার, অসমাপ্ত ছবিটি আছে “ যামিনী রায় সংগ্রহশালায়”।

প্রথিতযশা শিল্পী অগণিত পুরস্কার ও সন্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ১৯৩৪-৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস্‌’ – এর ভাইসরয় স্বর্ণপদক, ১৯৫৫ সালে ‘পদ্মভূষণ’ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে ললিতকলা অ্যাকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সন্মানসূচক “ডি-লিট্‌” উপাধি প্রদান করে। ভারতীয় ডাকবিভাগ যামিনী রায় অঙ্কিত ‘দুই নারী’ চিত্র সম্বলিত ডাকটিকিট প্রকাশ করে। যার মূল্য ছিল পঁচিশ পয়সা।

শান্ত, সৌম্য, বিনয়ী শিল্পীর অনন্ত তুলির টান ১৯৭২ সালের ২৪শে জুলাই স্তব্ধ হয়।

শিল্পীর মৃত্যু নেই, তিনি অমর। তাঁর অগণিত শিল্প কলায়, মহান শিল্পী তাঁর দীর্ঘ জীবন উৎসর্গ করেছেন শিল্পের সাধনায়। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য মানুষ নতুন করে আবিষ্কার করেছেন এই শিল্পসাধককে। রং ও রেখার অবিনশ্বর কবিতার রচয়িতা তিনি। বাংলার অসামান্য ঐশ্বর্য উদ্‌ঘটিত হয়েছিল তাঁর তুলিতে। তাঁর ছবি আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার।

তথ্যসূত্রঃ-

১। শিল্পী মানুষ যামিনী রায়ঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ও সুমন চট্টোপাধ্যয়।

২। আর্ট অফ যামিনী রায়ঃ প্রশান্ত দাঁ।

৩। যামিনী রায় বিষ্ণু দে বিনিময়ঃ অরুণ সেন।

৪। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ।

৫। আরাত্রিক – সম্পাদক-দুর্গাদাস মিদ্যা, ১২৫ বছরে যামিনী রায় শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা -১৪২০।

বাংলা নাট্য আন্দোলনের সূচনাপর্ব: বিজন ভট্টাচার্যের আগুন, জবানবন্দী ও নবান্ন

পূর্বাশা ওঝা

বাংলা সাহিত্যে নাট্য আন্দোলনের সূচনা ৪০’এর দশকের অশান্ত অস্থির পরিবেশের মধ্যে হলেও, তার প্রস্তুতি গড়ে ওঠে ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে উল্লিখিত সন্ধ্যে দেওয়ার আগের সকাল বেলার সলতে পাকানোর মতো। যা ছাড়া সন্ধ্যে দেওয়ার কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই নাট্য আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনার আগে সেই প্রস্তুতির ইতিহাসকে ঝালিয়ে দেখে নেওয়া জরুরি। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হয়। এ সম্পর্কে সুনীল দত্ত তাঁর ‘নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর’ গ্রন্থে জানিয়েছেন,

“১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর একটি অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা। যে সন্ধ্যায় আমরা, যারা দিন আনি, দিন খাই, অতি সাধারণভাবে যারা জীবন কাটাই, যারা জাতীয় শিল্প সংস্কৃতিকে বুক দিয়ে রক্ষা করি, সেই সাধারণ মানুষ প্রথম নাটক দেখার দরজা খোলা পেল। বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হল।”১ [দত্ত, পৃ-১]

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে বাংলা নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই দিনটি এতো গুরুত্বপূর্ণ কেন? এতোদিন কি তবে নাট্যজগতে সাধারণের প্রবেশ বর্জিত ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাতে হয়।

বাঙালি চিরকালই নাট্যমোদী। বাংলা সাহিত্যের আদি লগ্নের নিদর্শনের মধ্যে তার পরিচয় নানান ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এমনকি সম্পূর্ণ মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যেও নাট্যচর্চার সেই অস্তিত্ব বার বার দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু বাংলায় প্রথম মঞ্চ বিদেশিদের দান। যার প্রতিষ্ঠা ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে রুশ দেশিয় হেরাসিম লেবেডফ করেছিলেন। এর পূর্বে লৌকিক আকারে নাটকের অস্তিত্ব ছিল যাত্রা-কথকতার মধ্যে থাকলেও কোন সুপরিকল্পিত মঞ্চ বা থিয়েটার বঙ্গদেশে ছিল না। বিদেশী রঙ্গালয় বাঙালি উচ্চবিত্তদেরকে নাটক বিষয়ে উৎসাহিত করে তোলে। যার পরিণতিতে বড়লোক বাবুরা তাঁদের বাড়িতেই বিদেশি আদলে থিয়েটার নির্মান করান। এই ভাবেই বাংলা নাট্যক্ষেত্রে সৌখিন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। স্বভাবতই এই থিয়েটার যেহেতু মুষ্টিমেয় অভিজাতদের অবসর বিনোদনের জন্য গঠিত হয়, তাই সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশ বর্জিত ছিল। জনগণের একটা বিশাল অংশ এই নাট্যচর্চা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা এই অবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে এল। যে থিয়েটারে সকলের প্রবেশ বর্জিত ছিল তা ব্যবসায়িক হয়ে ওঠায় অর্থের বিনিময়ে সাধারণ জনগণের জন্য থিয়েটারের দরজা উন্মুক্ত হল। থিয়েটার আর কোন জমিদার গৃহের নিজস্ব খেয়ালখুশির বিনোদন হয়ে থাকল না। সেখানে প্রবেশাধিকার ঘটল সকলের। ‘নীলদর্পন’ নাটকের মাধ্যমেই এই থিয়েটারের শুভ উদ্ঘাটন হয়। সাধারণের কাছে নাটকের দরজা খুলে যাওয়ার জন্যই নয়, সাধারণের নাটক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে ‘নীলদর্পণ’ এক ভিন্ন মর্যাদা রাখে। এ সম্পর্কে একটি অভিমত উল্লেখযোগ্য,

“...বাস্তব জীবনের ভিত্তির উপর সাহিত্য রচনার ভিতর দিয়ে বাংলা সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হল নীলদর্পণের মধ্য দিয়েই। ভদ্র সমাজে যাদের সুখ-দুঃখের কথা এতোদিন অপাংক্তেয় ছিল গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে যাদের প্রবেশের দরজা এতোদিন বন্ধ ছিল, দীনবন্ধু মিত্রই সেই সব সর্বহারা মানুষদের মঞ্চে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তাঁদের জীবন সত্যকে তুলে ধরার জন্য।”২ [দত্ত, পৃ-৩]

সমকালীন রাজনৈতিক অত্যাচারের কথা যে নাটকের আকারে তুলে ধরা যেতে পারে তা ‘নীলদর্পণ’ নাটকেই প্রথম উঠে এলো। সেইসঙ্গে আরও একটি বিষয় এই নাটকে স্থান পেয়েছিল, যে কারণে ‘নীলদর্পণ’ বাংলা সাহিত্যে প্রথম গণনাটক হিসাবে গৃহিত তা হল; অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ ও তাদের সংগ্রামের কথা। নায়ক রূপে না হলেও, নীলদর্পণে - ভদ্রেতর চরিত্রগুলির গুরুত্ব কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এই ধরনের খেটে খাওয়া মানুষেরা যে নাটকে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে তা দীনবন্ধু মিত্রই প্রথম তুলে ধরলেন তাঁর ‘নীলদর্পণ’ নাটকে। তাই সমকালীন নাট্যজগৎ ও পরবর্তী বাংলা নাট্য আন্দোলনের আদর্শ তৈরিতে এই নাটকের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘নীলদর্পণে’র আদর্শ সমকালে কিছু দর্পণ নাটকের জন্ম দিলেও বাংলা নাট্যক্ষেত্রে কোন আন্দোলনের ধারাবাহিকতা সূচনা করতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায়, মূলত ব্যবসায়িক থিয়েটারের মুনাফা লাভের প্রচেষ্টা এবং সরকারের কঠোর আইন প্রণয়ন এই পথকে রুদ্ধ করেছিল। কারণ একথা ভুলে গেলে চলবে না, নাটক এইসময় ব্যবসায়িক থিয়েটারের জগতে প্রবেশ করেছিল। তাই লাভ-লোকসানের উপর এই থিয়েটারগুলি এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত মানুষের রোজগার এর সঙ্গে জুড়ে ছিল।

চল্লিশের দশকে এই পরিস্থিতি পরিবর্তীত হলো। প্রায় সত্তর বছর পর ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের হাত ধরে এই পরিবর্তন এলো। বাংলায় গণনাট্য সঙ্ঘ বা IPTA–র (Indian peoples theatre association) প্রতিষ্ঠা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সাংস্কৃতিক শাখা হিসাবে হয়। যদিও এই গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেকগুলি স্তর কাজ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সমগ্র বিশ্বজুড়ে এক অস্থির অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। সমগ্র বিশ্বে ফ্যাসীবাদী শক্তির উত্থান পৃথিবী জুড়ে যে সংকটের সূচনা করেছিল তারই পরিণতিতে এদেশে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘প্রগতি লেখক সংঘে’র জন্ম হয়। যার বাংলা শাখার থেকেই চল্লিশের দশকে ‘ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’ গড়ে ওঠে। বাংলায় ‘গণনাট্য সংঘ’ গঠনে বিশেষ এই সংঘের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪১ সালে ব্যাঙ্গালোরে IPTA’র প্রথম ইউনিট গঠিত হয়। এরপর বোম্বাই শাখা গঠিত হয় ১৯৪২- এ এবং সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে ওঠে ১৯৪৩ এর ২৫ মে। বাংলায় অবশ্য ছাত্র ফেডারেশন, ইয়ুথ কালচারাল ইন্সটিটিউট (YCI) প্রভৃতি নানান সংগঠন গড়ে উঠেছিল; যা কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে বঙ্গদেশে প্রসারিত করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা রূপে বাংলাতে IPTA’র জন্ম হয় ১৯৪৩ সালে। এর অনেক আগেই অবশ্য বাংলায় ‘প্রগতি লেখক সংঘ’ ও ‘ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে’র মাধ্যমে নাটকে সমকাল ও সমকালীন মানুষ বিষয় রূপে প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। ‘গণনাট্য সংঘের’ প্রতিষ্ঠা এই ধারায় এক নতুন সংযোজন।

গণনাট্যের এই ধারণা একেবারেই এদেশিয় ছিল না। তার সূচনা হয় বিদেশি পিপলস থিয়েটারের আদলে। উনিশ শতকের প্রথম দশকে ফরাসী মনিষী রোমা রোঁলার ‘The people’s theatre’ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। যা সমগ্র বিশ্বে গণনাট্যের চেতনা বিস্তার করে। মার্ক্সীয় স্যোশাল রিয়ালিজমের ধারণা থেকে এই পিপলস থিয়েটারের বিস্তার ঘটে। যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে শ্রেনীহীন শাসনের কথা প্রাধান্য পায়। নাটক যে শুধু অবসর বিনোদন কিংবা যা ঘটছে তার প্রতিচিত্রণের মাধ্যম নয় বরং তা সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যম তা বলা হয় এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বলা হল,

“The people must not of course see only themselves represented in their drama, but they ought to be raised from the humiliating position they have so long occupied our stage.”৩ [Rolland, Page-116].

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রাথমিক পর্যায়ে এই পিপল্‌’স থিয়েটারের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়।

রমা রঁলার পিপলস থিয়েটার মানুষকে গতানুগতিক নাট্য ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে নাটককে মানুষের প্রয়োজনের হাতিয়ার করে তুলতে শেখালো। এতোদিন নাটক ও নাট্যমঞ্চ ছিল শাসক শ্রেণির হাতিয়ার যা মানুষকে জীবনের সমস্যা ও সংগ্রামের থেকে দূরে সরিয়ে রাখত। নাট্যমঞ্চ প্রকারান্তরে কায়েমি স্বার্থের রক্ষক হয়েছিল। রমা রঁলা এই ধারনায় বাদ সাধলেন। তিনি এই ধরনের শিল্পকে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ এবং প্রমোদলোভী বিলাসীদের থিয়েটার রূপে উল্লেখ করলেন। তিনি জানালেন যে থিয়েটারকে বাঁচাবার একটি মাত্র পথই আছে, তা হল এমন একটি থিয়েটার তৈরি করা যেখানে জনগণকে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলা যাবে। থিয়েটার মানুষের জীবন সংগ্রামের পাশে দাঁড়াবে। পিপলস্‌ থিয়েটারের বিশিষ্টতায় রমা রঁলা তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেন, people’s theatre is that is 1) must be recreation, 2) ought to be source of enargy, 3) ought to be guiding light to the intelligence.

নাটকের ক্ষেত্রে রমা রঁলা সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনের উপর জোর দেন। তিনি জানান এতে যদি নাটকের বৈদগ্ধ্যগুণ ক্ষুণ্ণ হয়, তবু ক্ষতি নেই। সাধারণ জনগণের জীবনের কথা প্রাণের কথা তাদের সহজবোধ্য আনন্দ-প্রমোদের মাধ্যমেই বলতে হবে। কারণ নাটক যদি দর্শককে আনন্দ না দিয়ে বিরক্ত করে, তবে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তাই তিনি recreation এর কথা বলেছিলেন। দর্শকদের নতুন জীবনভাবনায় অনুপ্রাণিত করবে এই থিয়েটার। সেইসঙ্গে তাদের জীবনের সমস্যা, তার কারণ এবং তা থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করাবে। ফলে থিয়েটারকে উদ্দেশ্যমূলক হতে হবে। শিল্প উদ্দেশ্যমূলক হয় না।– একথা পিপলস্‌ থিয়েটারের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য।

ভারতে গঠিত গণনাট্য সঙ্ঘও এই পিপলস্‌ থিয়েটারের আদর্শকেই সামনে রেখে তাদের আন্দোলন গড়ে তোলে। মূলত আদর্শের দিক থেকে বিদেশি অনুসারী হলেও, ভারতীয় গণনাট্যের ধারা ছিল ভিন্ন। তাদের প্রথম বুলেটিনে পাওয়া যায়,

“It is in this situation that the Indian People’s Theatre Association has been formed to co-ordinate and strengthen all the progressive tendencies that have so far menifested themselves in the nature of drama, songs and dances. It is not a movement which is imposed from above but one which has its roots deep down in the cultural awakening of the masses of india: not is it a movement which discards our rich cultural heritage, but one which seeks to revive the lost in that heritage by re-interpreting, adopting and integrating it with the most significant facts of our people’s lives and aspirations in the present epoch. It is a movement which seeks to make of our arts the expression and the organism of our people’s struggeles for freedom, economic justice and a democratic culture. it stands for the defence of culture against Imperialism and Fascism, and for enlightening the masses about the causes and solution of the problems facing them. It tries to quicken their awareness of unity and their passion for creating a better and just world order.”৪ [IPTA Bulletin, Internet].

গণনাট্য সংঘের এই বুলেটিন থেকেই বোঝা যায় যে কিছু মূল বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে তাদের কর্মকান্ড গড়ে উঠেছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

১) গণনাট্যের নাটকের কাহিনি আবর্তিত হবে জীবনের বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে।

২) এখানে থাকবে সে সমস্যা থেকে উত্তরণের পথও।

৩) প্রথানুগ নাটকের মতো কোন একক ব্যক্তি-নায়কের মহিমা নয়, নাটকে প্রাধান্য পাবে সমষ্টি বা গোষ্টী চেতনা। সেখানে ব্যক্তি থাকবে কেবল গোষ্ঠীর প্রতিনিধি রূপে।

৪) সাধারণ দর্শক হবে এই নাটকের মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি মেহনতি মানুষদের মনোরঞ্জন ও তাদের চেতনার জাগরণের প্রচেষ্টাই হবে এই নাটকের অভিনয়ের মূল এজেন্ডা।

৫) নাটকে গণসঙ্গীতের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

৬) নতুন নাটক গড়ে উঠবে একেবারে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে কেন্দ্র করে।

৭) সমসাময়িক সমস্যা বা অর্থনৈতিক বৈষম্য স্থান পাবে এই নাটকগুলিতে।

প্রধানত এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে রেখেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা অনেকেই নাটক লেখার ক্ষেত্রে অগ্রসর হন। যার নাটকের মাধ্যমে বাংলায় এই গণনাট্যধারার সূচক ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। গণনাট্য সংঘের হাত ধরেই বাংলা নাটক লেখায় তিনি মনোনিবেশ করেন। তাই কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্ক্সীয় চিন্তাধারার প্রভাব তাঁর নাটকের মধ্যে বিশেষ রূপে দেখতে পাওয়া যায়।

আক্ষরিক অর্থে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই ‘ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে’র প্রযোজনায় বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক ‘আগুন’ ১৯৪৩ সালে বিনয় ঘোষের ‘ল্যাবরটারী’ নাটকের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ‘আগুন’ নাটকটির মূল বিষয় ছিল খাদ্যসংকট এবং সরকারী রেশনিং এর অব্যবস্থাকে তুলে ধরা। সেইসঙ্গে নাটকটি একটি বিশেষ আশাবাদী বার্তা মানুষের কাছে নিয়ে আসে। তা হল মিলে-মিশে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা। গণনাট্য সংঘের অন্যতম এজেন্ডা ছিল মানুষকে সমকালীন পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি, তাদের করণীয় সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল করে তোলা। এই এজেন্ডারই প্রতিফলন দেখা যায় বিজন ভট্টাচার্যের ‘আগুন’ নাটিকাটিতে। বিজন ভট্টাচার্য এই নাটকটিতে কিছুটা experiment করেন। স্কেচ্‌ধর্মী ছোট ছোট দৃশ্যের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেন সমকালীন বাস্তবতাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক কালে যে খাদ্য সংকটের সমস্যা তৈরি হয়, তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জীবিকা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকেই সমানভাবে প্রভাবিত করেছিল। ধনী বুর্জোয়া শ্রেণী এর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল তাদের অর্থের দুর্নীতির জোরে। সাধারণ মানুষ এই খাদ্য সংকটের পেষণে জর্জরিত হয়েছিল। বাংলায় মন্বন্তর তখনও সম্পূর্ণ রূপে নেমে আসেনি কিন্তু তার পদধ্বনি খাদ্যসংকটের সঙ্গেই সূচিত হয়ে গেছে। ‘আগুন’ নাটিকার পাঁচটি ছোট ছোট দৃশ্যে সেই বাস্তবতাকেই লেখক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

নাটকের মূল বিষয়ে সমকালীন খাদ্যাভাব জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। প্রথম দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায় এক সবজি বিক্রেতার উৎকণ্ঠা। রেশনের কিউ’-তে না দাঁড়াতে পারলে হয়ত চাল পাওয়া যাবে না। দিন এনে দিন খাওয়া লোক তারা। তাই প্রথমে অর্থের ব্যবস্থা করতে হয়, পরে ঘরে অন্ন আসে। কিন্তু রেশনিং ব্যবস্থায় সময়ে না পৌঁছতে পারলে, ‘কুড়োনের মা’-এর মতো খালি হাতেও ফিরতে হতে পারে। তখন ঘরে অর্থ এলেও জুটবে না অন্ন। যা একজন মানুষের জীবন ধারনের প্রাথমিক চাহিদা। তাই স্ত্রী-পুত্র সকলকেই সে সজাগ করতে চায়। নাটকের প্রথম দৃশ্যে বর্ণিত এই একই উৎকণ্ঠা দেখতে পাওয়া যায় দ্বিতীয় দৃশ্যেও। শুধু বদল হয় জীবিকার। এক নবযুবক চাষি এবং তার স্ত্রী এই দৃশ্যের চরিত্র। কিন্তু সমস্যা সেই একই- খাদ্যসংকট। লাইন-এর প্রথমে দাঁড়িয়ে নিজের খাদ্যকে সুনিশ্চিত করা। আগের দৃশ্যে নিদ্রা বিসর্জন দিতে হয়েছিল, এই দৃশ্যে প্রেমকে অবহেলা করতে হয় কৃষককে। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে কারখানার শ্রমিককে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানেও সেই একই উৎকন্ঠার কথাই উঠে এসেছে। এখানে অবশ্য খাদ্যসংকট ছিনিয়ে নিয়েছে পারিবারিক শান্তি ও সৌহার্দ্য। তাই স্ত্রী–কন্যার প্রতি অত্যাচার করেছে শচীন। চতুর্থ দৃশ্যে আপিসের কেরানি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হরেকৃষ্ণবাবু এবং তার স্ত্রী মনোরমার মধ্যেও দেখা গেছে সেই একই উৎকণ্ঠা। অফিসের বড়কর্তাদের দুর্নীতির ফলে তার মতো সাধারণ ছা-পোষা কর্মচারীরা বঞ্চিত হয়েছে। যা হরেকৃষ্ণবাবুর ঈশ্বর বিশ্বাসকে দোলাচল স্থানে এনে ফেলেছে।

যে কিউ এর কথা এই চারটি দৃশ্যে আছে, নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে সেই কিউতেই নিয়ে যান লেখক। সেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ একই লাইনে দাঁড়িয়ে এবং তাদের প্রত্যেকের মনে একই উৎকণ্ঠা। সিভিক গার্ড এদের মানুষ বলে মনে করে না, অপমান করে। চারিদিকের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় রেশন পাওয়ার তাগিদে। তারই মাঝে এক যুবকের ‘আগুন আগুন’ চিৎকার, সমস্ত অশান্তি থামিয়ে দিয়ে মানুষকে সতর্ক করে দেয় তাদের পেটের আগুন সম্পর্কে। যা থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র উপায় সকলের সংগবদ্ধভাবে বাঁচার প্রচেষ্টা করা। হরেকৃষ্ণবাবুর মুখে উঠে আসে সেই বাস্তবতার কথা,

“সমস্যা সব্বার। এই তো দ্যাখো না সামান্য দু সের চালের জন্যে কি নাজেহালটাই না হতে হচ্ছে। আচ্ছা বল, একথা কি ভেবেছি কোনোদিন,স্বপ্নেও। তা আজ আর কারো গর্বের কিছু নেই রে দাদা।”৫ [ভট্টাচার্য, পৃ-১১]।

৩য় পুরুষ সেই সমস্যার সমাধান টেনেছে এইভাবে- “এখন বাঁচতে হবে বাঁচতে হলে মিলে মিশে থাকতে হবে ব্যাস্‌।”৬ [ভট্টাচার্য, পৃ-১১]। নাটকের শেষে সকলে চাল পায়। নাটককার অবশ্য এতো সহজ সাময়িক মীমাংসা দিয়ে নাটকের যবনিকা টানেনি। কারণ তিনি জানতেন সমকালীন পরিস্থিতি এর থেকে অনেক কঠিন ছিলো। বাংলায় মন্বন্তর দেখা দেয়নি তখনও, এছিল মন্বন্তরের পূর্বাভাস। সমকালীন সমস্যার পাশাপাশি নাটকে দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে উত্তরণের পথ। ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে ভিন্ন ভিন্ন জীবিকার মানুষ নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে; প্রত্যেকেরই গুরুত্ব সমান। তাদের সমস্যাও এক। সমগ্র জনতাই সেখানে নায়ক রূপে স্থান পেয়েছে। ফলে গণনাট্যের যে আদর্শকে সামনে রেখে বিজন ভট্টাচার্য নাটক রচনায় অগ্রসর হন আগুন সেই হিসেবে যথাযথ।

বিজন ভট্টাচার্যের পরবর্তী আরও দুটি নাটক ‘জবানবন্দী’ এবং ‘নবান্ন’-তে এই একই সমস্যার কথা উঠে এসেছে। কিন্তু তা এসেছে আরও বিস্তৃত এবং ভয়াবহ রূপে। ‘আগুন’-এ যে সমস্যার উপস্থাপনা ছিল ‘জবানবন্দী’তে সেই সমস্যার কথাই কঠিন বাস্তবের মোড়কে প্রকাশিত। নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে গ্রামের ক্ষুদ্র চাষি পরান মণ্ডলের পরিবার। কোন কল্পনার আশ্রয়ে নয়, বাস্তবতার পূজারি ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। চল্লিশের দশকের অশান্ত অস্থির পরিবেশে সমগ্র কলকাতার পথে ঘাটে গ্রাম থেকে যে ভুখা মিছিলের আগমন হয়েছিল তা তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন,

“ডি এন মিত্র স্কোয়েরের পাশ দিয়ে রোজ আপিস যাই। রোজই দেখি, বুভুক্ষু মানুষের সংসারযাত্রা। নারী পুরুষ শিশুর সংসার দেখি বললে ঠিক বলা হবে না। আমি লজ্জায় চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাতে পারতাম না। চোখ না তুলেও যেতে যেতে ওদের উপস্থিতি টের পেতাম। এক একদিন রাস্তার ওপরেই শায়িত মৃতদেহ, নোংরা কাপড়ে ঢাকা। মৃতদেহগুলো যেন জীবিত মানুষের চেয়ে অনেক ছোট দেখায়। বয়স্ক কি শিশু, আলাদা করা যায় না। আপিস যাওয়ার পথে অন্য দৃশ্য দেখি। টেলিগ্রাফের তাঁর কাটতে গিয়ে পাকা ফলের মতো টুপ করে রাস্তায় পড়ে অল্পবয়সী ছেলে। আমি নিজেও একদিন কলেজ স্ট্রিটে প্রচণ্ড মার খেলাম। আপিস থেকে ফেরবার পথে রোজই ভাবি, এই সবকিছু নিয়ে লিখতে হবে। কিন্তু কিভাবে লিখব? ভয় করে, গল্প লিখতে গেলে সে বড় সেন্টিমেন্টাল প্যানপেনে হয়ে যাবে। একদিন ফেরবার পথে কানে এল, পার্কের রেলিঙের ধারে বসে এক পুরুষ আর এক নারী তাদের ছেড়ে আসা গ্রামের গল্প করছে, নবান্নের গল্প, পূজোপার্বণের গল্প, ভাব্বার চেষ্টা করছে তাদের অবর্তমানে গ্রামে তখন কী হচ্ছে। আমি আমার ফর্ম পেয়ে গেলাম নাটকে ওরা নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে।”৭ [ভট্টাচার্য, পৃ-বারো- তেরো]।

এই বাস্তবতাকেই ‘জবানবন্দী’ নাটকে তুলে ধরেছেন লেখক। দুর্ভিক্ষে গ্রামের চাষি পরাণ মণ্ডল খাদ্যের সন্ধানে সপরিবারে শহরে চলে আসে। কিন্তু শহরে এসে তাদের সমস্যা কম হয় না। বরং চাষি থেকে তারা ভিখারিতে পরিণত হয়। ‘আগুনে’র কিউ-এ যে খাদ্যসমস্যার সূচনা ‘জবানবন্দী’তে এসে তা এক ভয়াবহ মন্বন্তরের রূপ পরিগ্রহ করে। গ্রামে শুধু অন্নের অভাব ছিল, কিন্তু শহরে এসে মান সম্মানও বিসর্জন দিতে হয়েছে তাদের। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার প্রলোভনে গ্রাম থেকে শহরে এসে নিঃশেষ হয়ে যায় মাঠে সোনা ফলানো চাষি পরান মণ্ডল। শেষ হয়ে যায় একের প্রতি অপরের মায়া-মমতা পারস্পরিক মূল্যবোধ। তাই বেন্দার মা অনায়াসে একাই সমস্ত খিচুড়ির হাড়ি শেষ করে দেয়। পরানের ঘরে তার পৌত্র মানিক অন্নাভাবে মারা যায়, অশান্তি নেমে আসে, পুত্রবধূ সামান্য অর্থের জন্য ব্যাভিচারিনী হয়। অবশেষে সব হারিয়ে পরান মন্ডল মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। কিন্তু এখানেও লেখক ইতিবাচক পরিণতি দিয়ে নাটকের যবনিকা টেনেছেন। সামান্য আশার সঙ্কেত বজায় রেখেছেন নাটকের শেষে। যদিও সমকালীন পরিস্থিতির জটিলতা এর থেকেও ভয়াবহ ছিল। সেকালে দুর্ভিক্ষ বহু সম্পন্ন গৃহস্থকে ভিখিরি করেছে, বহু কূলবধূকে পতিতা হতে বাধ্য করেছে। তবে এর থেকেও বড় সত্য সেইসময় ছিল কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষের অমানবিক ব্যবহার। বিশেষত নাটকে বেন্দার স্ত্রীর ব্যাভিচারের প্রসঙ্গ তৎকালীন তথাকথিত ভদ্রলোকদের মুখোশকেই তুলে ধরে। এ সম্পর্কে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের একটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তৎকালীন অবস্থার একটি ধারণ করা যায়।-

“আমি এমন কিছু ঘটনা জানি যে রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে থাকা দরীদ্র নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছে। অসহায় নারীদের অত্যাচার করবার মতলবে একদল লোক ঘোরাফেরা করছে বলে মনে হয়। নারীদের রক্ষার জন্য কোন সংঘবদ্ধ চেষ্টা এ যাবৎ হয়নি।”৮ [চৌধুরি, পৃ-৯২]।

জীবনের এই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকেই লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর নাটকে। কিন্তু নাটককার মানুষের মধ্যেকার বিশ্বাসকে হারিয়ে যেতে দিতে চাননি। কারণ ‘জবানবন্দী’ গণনাট্য সংঘের নাটক। যাদের উদ্দেশ্য কেবল সমস্যা নয়, তার সমাধানকেও তুলে ধরা। তাই নাটকের শেষে পরান মন্ডলের মৃত্যু হলেও তাঁর জবানবন্দী আবার মানুষকে বাঁচার আশ্বাস দেয়। মৃত্যুপথযাত্রী পরান জানায়,

“ঘরে ফিরে যা রমজান তোরা সব ঘরে ফিরে যা। আমার আমার সেই মরচে পড়া নাঙ্গল ক খানা আবার শক্ত করে, শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। খুব শক্ত করে চেপে ধরবি সোনা বেন্দা সোনা ফলবে, সোনা ফলবে। ফিরে যা ফিরে যা।”৯ [ভট্টাচার্য, পৃ-২৯]।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হলেও অন্যান্যদের বাঁচার পথ যে শহরে নয়, গ্রামে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই বর্তমান, তা নাটককার জানিয়েছেন। পরান মন্ডলের এই শেষ জবানবন্দী নাটকের আশার দিকটিকে প্রতিফলিত করেছে। এ সম্পর্কে দর্শন চৌধুরী তাঁর ‘গণনাট্য আন্দোলন’ গ্রন্থে জানিয়েছেন,

“দুর্ভিক্ষকে জীবনের সবকিছু বলে মেনে নিয়ে জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে শহুরে ‘ভদ্দরনোকে’র উদাসীন দয়ার অনুগ্রহে বাঁচা নয়, মানুষের ঐতিহাসিক শক্তির ওপর আস্থা রেখে, সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করে, এই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই করে যাওয়া- জবানবন্দীর শেষে এই সংকল্পের ক্ষীণ সূত্রপাত লক্ষ করার মতো।”১০ [চৌধুরি, পৃ-৩৮]।

এই সংকল্প পরান মণ্ডলের জবানবন্দীর মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ‘জবানবন্দী’ নাটকে পরান মন্ডল কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে উপস্থিত হলেও, চরিত্রটি মূলত চাষি সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। সমস্ত নাটকে ব্যক্তিচরিত্র নয়, শ্রেনিচরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। আসলে ১৩৫০-এর মন্বন্তরে যে নারকীয় মৃত্যুর তান্ডব বাংলাদেশের গ্রামগুলির উপরে নেমে এসেছিল তাতে বহু পরান মণ্ডল এইভাবে শহরের রাস্তায় হারিয়ে গিয়েছিল। বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের হিসেবে ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ১৮,০০৭৮৯ জন লোক মারা গিয়েছিল। যেখানে তার আগের পাঁচ বছরে ১১,৮৪,৯০৩ লোক মারা গিয়েছিল। বোঝা যায় ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর হার কীভাবে বেড়ে যায়। যদিও সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের এই হিসেবের থেকে বাস্তবে মৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশি। এ সম্পর্কে কমল চৌধুরী তাঁর গণ আন্দোলনের ছয় দশক গ্রন্থে জানিয়েছেন,

“বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগ দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর যে তালিকা প্রকাশ করেছে তা থেকেই ঘটনার মর্মান্তিক রূপ উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু অনেকের মতে, ঐ হিসাবে মৃত্যু সংখ্যা খুব কম ধরা হয়েছে। ফলে কমিশন ঢাকায় যখন সাক্ষ্য গ্রহন করে তখন সাক্ষীরা বলে ১৯৪৩ সালে ঐ জেলায় ১০ লক্ষ লোক মারা যায়। অথচ জনস্বাস্থ্য বিভাগের হিসেবে মৃত্যু সংখ্যা ১,৪৯০০০।”১১ [চৌধুরি, পৃ-৯১]।

গণনাট্য সংঘের আদর্শকে সামনে রেখে ‘জবানবন্দী’ নাটকের সাফল্যের পর বিজন ভট্টাচার্য পরবর্তী ‘নবান্ন’ নাটকটি লেখেন। ‘জবানবন্দী’-তে যে সমস্যার পরিচয় ছিল তারই বিস্তৃত রূপ উঠে এল পূর্নাঙ্গ ‘নবান্ন’-এ। নাটকটিতে কেবল ১৯৪২ –এর ভয়াবহ মন্বন্তরই নয়, সেইসঙ্গে উঠে এলো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, জাপানী হামলা, ব্রিটিশের পোড়ামাটি নীতি, ঝড়-বন্যা, মহামারী, কালোবাজারী, নারী পাচার চক্র প্রভৃতি নানান সমস্যার বাস্তব চিত্র। নাটকের পটভূমি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক স্বয়ং জানিয়েছেন,

“দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আধিদৈবিক দুর্ঘটনা, এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তীত হয়ে চূড়ান্ত একটা পরিণতির দিকে নিষ্ঠুরভাবে অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেকটি সমস্যা এমন বিরাট আর ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে যেন মনে হচ্ছে অনর্থ যা কিছু ঘটছে তাঁর উপর মানুষের যেন কোন হাত নেই। সচেতন বুদ্ধিজীবি মনও তখন সংশয় আর বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় ঘূর্ণায়মান। চরমতম এমনই সেই দুঃসময়ে ‘জবানবন্দী’র ইঙ্গিতের সূত্রধার শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার দেশ মেদনীপুর জেলার পটভূমিকায় প্রধান সমাদ্দারের নতুন জবানবন্দীতে ‘নবান্ন’ নাটক লিখতে বসলাম। মুমূর্ষু পরান মণ্ডলের চোখের সোনা ধানের দুঃস্বপ্নই প্রধান সমাদ্দারের চোখে প্রতিভাত হয় জবাকুসুমসংকাশং রূপে মৃত্যুকে বরণ করবার দুর্দমনীয় সংকল্প ঘোষণার মধ্য দিয়ে সে করে মৃত্যুকে অস্বীকার।”১২ [ভট্টাচার্য, পৃ-৩৭]।

মোট চার অঙ্কের ১৫টি দৃশ্যের এই নাটকে বিজন ভট্টাচার্য ১৯৪২ সালের দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণগুলিকেও জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে সমকালীন জাতীয় জীবনের একটি ছবি এঁকেছেন তাঁর এই ‘নবান্ন’ নাটকে। প্রথম দৃশ্যেই দেখতে পাওয়া যায় ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভুমি। জাপানী হামলা ও পুলিশি সন্ত্রাসের ফলে আমিনপুর গ্রামের পুরুষ নারী প্রত্যেককে মাঠে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে হয়েছে। নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার প্রশ্নে মাতঙ্গিনী হাজরার সাদৃশ্যে পঞ্চাননী সমবেত জনতাকে পরিচালনা করে প্রাণ দেয়। নাটকের এই প্রথম দৃশ্য সম্পর্কে সুধী প্রধান জানিয়েছেন, “প্রথম দৃশ্যে প্রজ্জ্বলিত মশাল হাতে জনতার অর্থ হল অগ্নিগর্ভ ভারত এবং তারপর পেছনের সাদা পর্দায় লাল আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে মেশিনগানের শব্দ- কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতারের প্রতীক’।”১৩ [প্রধান, পৃ-১০৯]। নাটকের প্লটে যে আগস্ট আন্দোলনের প্রতিফলন ছিল তারই স্পষ্টতর রূপ নাটকটি মঞ্চায়ণের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দুর্ভিক্ষের আভাস সূচিত হয়েছে। যার ফলে কুঞ্জ ও রাধিকার মধ্যে অশান্তি হয়েছে, নিরঞ্জন গৃহত্যাগী হয়েছে। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে নেমে এসেছে বন্যা এবং সাইক্লোন। মেদনীপুর ও ২৪ পরগনা জেলায় ১৯৪২ সালে নেমে আসা সাইক্লোন ও বন্যার ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। ‘নবান্ন’ নাটকটি এই মেদনীপুর জেলাকে পটভূমি করেই লেখা হয়েছিল তার প্রমাণ স্বয়ং লেখকের উক্তিতেই মেলে। নাটকে দয়ালের উক্তিতে বন্যার সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। আর জানা যায় ৪২’-এর এই সাইক্লোন ও বন্যায় এমন বহু ঘরই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল শুধুই হাহাকার “দয়াল: প্রধান, সুমুদ্দুর, চারিদিকে শুধু সুমুদ্দুর... জল আর জল, কিছু নেই, কিছু নেই শুধু জল সুমুদ্দুর উঠে এসেছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা! রাঙার মা!”১৪ [ভট্টাচার্য, পৃ-৫৫]।

নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যেই প্রধানের তিন মরাই ধান নষ্ট হওয়ার কথা আছে। ১৯৪৩ সালে জাপানী আক্রমনের ফলে ব্রিটিশ সরকার পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে। যার ফলে বহু ফসলের ক্ষেত জালিয়ে দেওয়া হয়। এই নীতির ফলে প্রধান সমাদ্দার ও তাঁর গ্রামের বহু ব্যক্তির ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার উল্লেখ নাটকে রয়েছে। ফসলের এই ঘাটতির পর সাইক্লোন এবং বন্যায় সমস্ত আমন ধান নষ্ট হয়ে যায়। ফলে নেমে আসে মন্বন্তরের করাল ছায়া। এর উপরে বন্যার পরে মারী-মড়কে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যেও সেই মড়কের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতির এই তাণ্ডব লীলার পাশাপাশি মানুষের অত্যাচারও কোন অংশে কম ছিল না। মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে জমিদার জোতদারেরা জোর করে কম দামে তাদের জমি আত্মসাৎ করেছে। মন্বন্তর মানুষকে এমন অবস্থায় নিয়ে ফেলেছিল যে কেউ কেউ নিজের সন্তানকেও বিক্রী করে দিয়েছে। যার উল্লেখ মেলে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে চন্দনের নিজের মেয়েকে বিক্রী করে ফেলার ঘটনায়। মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে হারু দত্ত, কালীধন ধাড়ার মতো মানুষেরা। এদের কার্যকলাপ থেকেই বোঝা যায়, যে এই মহামন্বন্তর কেবল মাত্র প্রকৃতির দান ছিল না। কারণ শুধুমাত্র প্রকৃতির দান হলে তা এতোখানি ভয়াবহ রূপ ধারণ করতো না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে আগুন জ্বালিয়েছিল তাতে ঘৃত সংযোগ করেছিল কিছু মুনাফাখোর মানুষ। দুর্ভিক্ষ –এর পরবর্তীকালে গঠিত তদন্ত কমিশন –এর রিপোর্ট সম্পর্কে ১৯৪৫ সালে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রকাশিত হয় (৮মে, ১৯৪৫)-

“বিলম্ব হইলেও অবশেষে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়ছে। ১৯৪৩-৪৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যে প্রধানত মনুষ্যসৃষ্ট এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থার অক্ষমতার জন্যই উদ্ভুত এবং শোচনীয় হইয়াছিল রিপোর্টে তাহাও স্বীকৃত এবং বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ অকস্মাৎ হস্তচ্যুত হইয়া যাওয়া, অথবা ১৯৪২ সালে ফসল কম পাওয়া কিংবা সিংহল, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, পশ্চিম ভারত প্রভৃতি ব্রহ্মের চাউলের উপর নির্ভরশীল দেশগুলির ভারতের উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মুখাপেক্ষী হইয়া পড়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের কয়েকটি কারণ হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার তাঁহাদের সুনিয়ন্ত্রিত নীতিদ্বারা যে ইহা নিবারণ করিতে পারিতেন কমিশন তাহা দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। কারণ শেষপর্যন্ত দেখা গিয়াছে যে সাধ্যাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধিই দুর্ভিক্ষের একটি প্রধান কারণ। পাঁচ ছয় গুণ মূল্যে চাউল কেনার সামর্থ্য যাহাদের ছিল না তাহারাই দুর্ভিক্ষের কবলে প্রাণ হারাইয়াছে। কিন্তু যাহারা অত্যাধিক মূল্য দিতে পারিয়াছে, তাহাদের খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা অসম্ভব হয় নাই। কমিশন বলিয়াছেন এই অবস্থার প্রতিকার করা যাইত। যথাসময়ে কঠোর হস্তে বণ্টনের সুব্যবস্থা করা হইলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্ভব হইত।... তাঁহারা সুব্যবস্থার পরিবর্তে নানারূপ ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সরকারী এজেন্সীর দ্বারা শস্য সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতে এজেন্ট নিয়োগ করিলেন এবং চতুর ব্যবসায়ীগণ তাহাদের সুবিধার সুযোগে অন্নসংকট আরও তীব্র করিয়া তুলিলেন।”১৫ [চৌধুরি, পৃ-১১৩]।

‘নবান্ন’ নাটকে এই ব্যবসায়ী রূপে উল্লেখ মেলে কালীধন ধাড়ার। তার গুদামে সঞ্চিত চালের প্রাচুর্য থেকেই কালোবাজারীর নগ্ন চিত্রটি পরিস্কার হয়। আইন যে ছিল এদের হাতের মুঠোয় তার উল্লেখ পাওয়া যায় কালীধনেরই এক কর্মচারী রাজীবের কথায়-

“রাজীব: (খল হেসে) আরে এগুলা কী পাগল নি দ্যাখছো কালীধন, কয় বলে পুলিশ ডাকমু। (কালীধনকে উদ্দেশ্য করে ভদ্রলোককে) বলে পুলিশ ডাকমু। আরে কত জজ মেজিস্ট্রেট এই বাবু ট্যাঁকে রাইখ্‌পার পারে তা নি জানো! আহাম্মক কোহানকার, তুমি দেখাও পুলিশের ভয়!”১৬ [ভট্টাচার্য, পৃ-৭১]।

সেইসঙ্গে বিত্তবান ব্যক্তিদের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সমকালীন পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলার পরিচয়ও নাটকে উঠে এসেছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে- “বড়কর্তা: হ্যাঃ ও বিধান আছে, আইন আছে, আবার আইনের ফাঁকও আছে।”১৭ [ভট্টাচার্য, পৃ-৭৮]। সমকালে সামর্থবান মানুষের ঔদাসীন্যও যে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় বিবাহ বাড়িতে তথাকথিত ভদ্রলোকদের সংলাপে-

“বড়োকর্তা: অসুবিধে মানে, চোরাবাজার। চোরাবাজার যদ্দিন আছে ততদিন-

২য় ভদ্রলোক: তাঁর আর কী করবে ভাই। সত্যি কথা বলতে গেলে এই চোরাবাজারটি ছিল বলে তাই এখনও কিছুতে আটকাচ্ছে না, নইলে করবে কী লোকে বল? ব্ল্যাকমার্কেটের সুবিধে না নিয়ে উপায় কী?”১৮ [ভট্টাচার্য, পৃ-৭৮]।

অন্যদিকে এই দৃশ্যেই লেখক সমান্তরালভাবে প্রাচুর্য ও অভাবের দৃশ্য এঁকেছেন। একদিকে বিবাহ বাড়ির প্রাচুর্যে খাদ্য নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে সামান্য খাদ্যের আশায় ডাস্টবিনে কুকুর ও মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে। এ যে নিছক কল্পনা ছিল না, তার পরিচয় সমকালে মেলে। এছাড়াও মানুষের হৃদয়হীনতার পরিচয় সমগ্র নাটকে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ গাঁয়ের চাষি প্রধান সমাদ্দারকে সপরিবারে শহরের লঙ্গরখানায় নিয়ে এসে ফেলে। যেখানে একদিকে ফটোগ্রাফারদের বিবেকহীন পেশাদারীত্ব, অন্যদিকে সরকারী অব্যবস্থা (ডাক্তারখানায় ওষুধ নেই) তাদের জীবনকে আরও দুর্বিসহ করে তোলে। একে একে পঅরিবারের সকলে আলাদা হয়ে যায়। বিনোদিনী নারী পাচারকারীর হাতে গিয়ে পড়ে। যেখান থেকে অনুমান করা যায় দুর্ভিক্ষে অসহায় মানুষেরা কীভাবে সমাজের শিকার হয়েছিল। নারীর অসহায়তার সুযোগের কথা এর পূর্ববর্তী ‘জবানবন্দী’ নাটকেও মেলে।

সমসাময়িক জীবনের এই বাস্তব রূপায়ণেই বিজন ভট্টাচার্য ক্ষান্ত হননি। কারণ গণনাট্য কেবল সমস্যাকেই প্রতিবিম্বিত করার কথা বলেনি। এই সংঘের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সমস্যা থেকে উত্তরণের পথটিও মানুষকে দেখানো। ‘নবান্নে’ও তাই এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ চিত্রিত হয়েছে। পরিণতিতে সাময়িকভাবে হলেও, সবকিছুর মীমাংসা হয়ে গেছে। তাই দেখতে পাওয়া যায়, নিরঞ্জনের উদ্যোগে বিনোদিনী মুক্তি পেয়েছে, কালোবাজারী মজুতদারেরা পুলিশের হেফাজতে গেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত চাষীরা গ্রামে ফিরে আবার নতুন করে ফসল ঘরে তুলেছে। কুঞ্জ- রাধিকা ফিরে এসেছে। গঠিত হয়েছে ধর্মগোলা। আগামী কোন দুর্ভিক্ষকে মোকাবিলা করার জন্য। ‘জবানবন্দী’র পরান মণ্ডল ফিরে না এলেও নাটককার নবান্নের প্রধান সমাদ্দারকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। সবকিছু ভুলে বাঁচার জন্য ফিরে এসেছে প্রধান। কিন্তু তবুও যে আশঙ্কা মানুষের মনে ছিল তার উত্তর লেখক দয়ালের মাধ্যমে দিয়েছেন, যে দুর্ভিক্ষ আর তাদেরকে শেষ করে দিতে পারবে না। কারণ ‘এবার জোর প্রতিরোধ’ গড়ে তুলবে তারা। যদিও বাস্তবে হয়ত এতোখানি মিলনাত্মক পরিণতি সম্ভব ছিল না। বিনোদিনীর এতো সহজে মুক্তি পাওয়া, মজুতদারদের জেলে যাওয়া, চাষিদের গ্রামে ফিরে এসে ধর্মগোলা গঠন, এসব কিছুই নাটকের পরিণতি যেন অতি সহজে হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। সমস্যাগুলি এতোখানি খুদ্রও ছিল না যে তার সমাধান সহজে হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে হিরণকুমার সান্যাল উল্লেখ করেছেন-

‘নবান্নে’র দুর্বলতম অংশ শেষ দৃশ্য। এই দৃশ্যে গ্রন্থকার যেভাবে তাঁর উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন তা শুধু রোম্যান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিহীন। মারী ও দুর্ভিক্ষে যে গ্রাম ছারখার হয়েছে ও এই প্রচণ্ড দ্বৈতবিভীষিকা যথেষ্ট নয় মনে করে গ্রন্থকার যে গ্রামকে বন্যা দিয়ে বিধ্বস্ত না করে খুশী হননি, ঠিক সেই গ্রামে সেই প্রধানের কুটির প্রাঙ্গনেওক্ষত দেহে ফিরে এলো একটির পর একটি গ্রামত্যাগী দুঃস্থ যারা দুদিন আগে শহরের পথের ডাস্টবিন্‌ হাতড়ে খুঁজেছে ও জীবন ধারনের শেষ সম্বল।”১৯ [সান্যাল, পৃ-১১৬]।

‘নবান্ন’ নাটকের দোষ ত্রুটি বিচার করার আগে একথা মনে রাখা একান্ত জরুরি যে নাটকটি গণনাট্য সংঘের নাটক ছিল। যে সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। আর তা করতে গিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গ্রামের বর্ণনা দেওয়া একেবারেই বাস্তব সম্মত ছিল না। তাই আমিনপুর গ্রাম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। একথা সত্য যে নাটকের সমস্যাগুলির সমাধান অতি সহজেই হয়েছে। তবে তা হয়েছে বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই। কারণ কী হয়েছে তা দেখানোই নয়, কী হলে তা থেকে বেরিয়ে আসা যায় তা দেখানোও গণনাট্যের নাটকের অন্যতম লক্ষ্য। তাই হিরণকুমার সান্যাল সমালোচনা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করেছেন, “...‘নবান্ন’ সত্যিকারের জননাট্যের পথ তৈরী করেছে। এইখানেই তার মহত্তম স্বার্থকতা।”২০ [সান্যাল, পৃ-১১৭]।

নাটকে কেবল মিলনাত্মক পরিণতিই নয়, বর্ণিত হয়েছে গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষকদের কথাও। নাটকের চরিত্রগুলি তাই কোন ব্যক্তি চরিত্র রূপে উঠে আসেনি। কারণ ব্যক্তিকেন্দ্রীক জীবনের পরিবর্তে যুগ-জীবনই গণনাট্যের মূল প্রত্যাশিত বিষয়। প্রত্যেকেই এখানে নিজ নিজ শ্রেনির প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রধান সমাদ্দার এখানে কিছু ভিন্ন রূপে উপস্থাপিত হলেও তার পরিবারের সকলেই সমগ্র চাষি সমাজের সঙ্গে একাত্ম। দয়ালের স্বজন হারানোর বেদনা সমগ্রই চাষি সমাজেরই বেদনা। রাধিকা-বিনোদিনী গ্রাম বাংলার সহজ সরল চাষি পরিবারের গৃহবধূ। কুঞ্জ-নিরঞ্জন প্রত্যেকেই চাষি সমাজেরই অংশরূপে উপস্থাপিত। এমনকি হারুদত্ত ও কালীধন জোতদার ও মজুতদার শ্রেনির প্রতিনিধি হিসাবে নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। প্রধান সমাদ্দার নাটকে কেবল একটু ভিন্ন স্থান লাভ করেছে। যদিও ‘নবান্ন’ নাটকে ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব অপেক্ষা জীবনের প্রবহমানতাই গুরুত্ব পেয়েছে। যে প্রবহমানতায় ব্যক্তির পরিবর্তে গোষ্ঠীর গুরুত্বই স্বীকৃত হয়েছে।

যারা একেবারে নিম্ন সাধারণ মানুষ তাদের কথাই ‘নবান্ন’ নাটকের মূল আলোচ্য বিষয় রূপে উঠে এসেছে। সেখানে অযথা কোন আড়ম্বর প্রকাশ পায়নি। যে দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন কৃষকরা হয়েছিল তাদের থেকে প্রতিরোধের মাধ্যমে বেরিয়ে আসার কথা যে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করবে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। নাটকে আঞ্চলিক সংলাপের প্রয়োগ নাটকটিকে সকলের কাছে সহজে বোধগম্য করে তুলেছে। সমস্ত দুঃখের অবসানের পর সকলের ‘নবান্ন’ উৎসব পালনে গণসঙ্গীতের ব্যবহার ‘নবান্ন’-কে গণনাটকের পথে আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছে।–

“আপনে বাঁচলে বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান

হিন্দু মুস্লিম যতেক চাষি দোস্তালি পাতান

এছাড়া আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।

আজও যদি শিক্ষা না হয় শিক্ষা হবে কবে।।”২১ [ভট্টাচার্য, পৃ-১০৯]।

এছাড়াও মুরগী লড়াই, বলদ দৌড়, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সাধারণ গ্রাম বাংলার সংস্কৃতির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ‘নবান্ন’ মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও চট, খড়ের আবরণ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছিল। যা নাটকটিকে গণনাট্যের মর্যাদায় উন্নীত করে। নবান্নের সাফল্য পরবর্তীকালে নাটকটিকে গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক মাইলস্টোন করে তোলে। ‘নবান্নের সমকালে দুর্ভিক্ষের পটভুমিকায় বেশ কিছু নাটক লেখা হয়, কিন্তু কোনটিই ‘নবান্নে’র জনপ্রিয়তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। কারণ ‘নবান্ন’ তার সমকালকে আত্মস্থ করেও কালোত্তীর্ণ হয়েছিল। সেই কারণেই শম্ভু মিত্র বলেছিলেন, “শ্রী বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ‘নবান্ন’ যেন শ্মশানচারী ভৈরব শিবের মূর্তি, কোন মিথ্যে নেই কোন ছলা কলা নেই।”২২ [মিত্র, পৃ-১২৮]।

গ্রন্থ ঋণ-

১। দত্ত, সুনীল। ***নাট্য আন্দোলনের তিরিশ বছর***। কলকাতা: জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৯, পৃ-১।

২। তদেব, পৃ-৩।

৩। Rolland, Romain. The People’s Theatre, – Translated by Barllett. H. Clark, New York, pg- 116.

৪। Indian people’s Theatre Association, Bulletin no. 1, july, 1943. Internet.

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শমিক & নবারুণ ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ ১। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃ-১১।

৬। তদেব, পৃ-১১।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, শমিক & নবারুণ ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ ১। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃ- বারো- তেরো।

৮। চৌধুরী, কমল। গণ আন্দোলনের ছয় দশক ১ম খন্ড। কলকাতা: পত্র ভারতী পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ-৯২।

৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, শমিক & নবারুণ ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ ১। কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃ-২৯।

১০। চৌধুরী, দর্শন। গণনাট্য আন্দোলন। কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১৯৯৪ পৃ-৩৮।

১১। চৌধুরী, কমল। গণ আন্দোলনের ছয় দশক ১ম খন্ড। কলকাতা: পত্রভারতী, ২০০৯, পৃ-১০৯।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শমিক & নবারুণ ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ ১। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃ- ৩৭।

১৩। প্রধান, সুধী। ‘নবান্ন: প্রযোজনা ও প্রভাব’। বহুরূপী, নবান্ন সংখ্যা. কলকাতা: কালিপ্রসাদ ঘোষ অটোপ্রিন্ট অ্যাণ্ড পাবলিশার্স হাউস, অক্টোবর, ১৯৬৯, পৃ- ৯১।

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, শমিক & নবারুণ ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ ১। কলকাতা: দেজ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ-৫৫।

১৫। চৌধুরী, কমল। গণ আন্দোলনের ছয় দশক। কলকাতা: পত্রভারতী, ২০০৯, পৃ-১১৩।

১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, শমিক & নবারুণ ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ ১। কলকাতা: দেজ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ-৭১।

১৭। তদেব, পৃ-৭৮।

১৮। তদেব, পৃ-৭৮।

১৯। সান্যাল, হিরণকুমার। ‘নবান্ন’, বহুরূপী, নবান্ন সংখ্যা। কলকাতা: কালিপ্রসাদ ঘোষ অটোপ্রিন্ট অ্যাণ্ড পাবলিশার্স হাউস, অক্টোবর, ১৯৬৯ পৃ-১১৬।

২০। তদেব, পৃ-১১৭।

২১। বন্দ্যোপাধ্যায়, শমিক & নবারুণ ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ ১। কলকাতা: দেজ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ- ১০৯।

২২। মিত্র, শম্ভু। প্রসঙ্গ: নাট্য- কলকাতা: ডিসেম্বর, ১৯৭১, পৃ-১২৭-১২৮।

বাউল সাধনাই বাউলদের জীবনাদর্শ

জয়ন্ত মণ্ডল

বঙ্গদেশে ধর্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাসের ঘরানায় অন্যতম হল বাউল সম্প্রদায়। শুধুমাত্র তাই নয়, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বাউল সঙ্গীত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু ভালো করে পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায় যে, বাউল সম্প্রদায়ের প্রারম্ভিক রূপের সূত্রপাত ঘটেছিল দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের হাত ধরে। কারন বৌদ্ধতন্ত্র সহজিয়া সাধকরা তাদের নিগূঢ় কায়া সাধনাকে পদের মধ্যদিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তেমনি বাউল সম্প্রদায়ও বাউল গান ও সাধনার মাধ্যমে অনুসন্ধান করেছিলেন ‘মনের মানুষ’ ‘অচিন পাখি’ ও ‘সোনার ময়নার’। রবীন্দ্র সাহিত্যের নিবিড় পাঠের ফলে আমরা বারংবার দেখতে পাই প্রকৃতির সাথে মানবের মিলন তত্ত্বের প্রসঙ্গ; কখনও বা তিনি ক্ষুদ্র আমিত্বের আবেষ্টনী ভেঙ্গে মেলে ধরতে চেয়েছেন নিজেকে বৃহৎ আমিত্বের রাজ্যে। এই মিলন তত্ত্বই হল মানবপ্রীতি তত্ত্ব তথা অতীন্দ্রবাদ, যা বাউল দর্শনের মুখ্য বিষয়। তাই তাঁরা ঘরের চাবি ভেঙ্গে ভাবের নৌকাতে ভেসে চলেছে উদাস পথিক হয়ে অমৃতকুম্ভের সন্ধানে।

‘বাউল’ শব্দটির উদ্ভব প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহলে মতভেদ থাকলেও তাঁদের সামগ্রিক চিন্তা ভাবনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সংস্কৃত ‘ব্যাকুল’ বা ‘বাতুল’ শব্দ থেকে বাউল শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। আবার অনেকে মনে করেন হিন্দি ‘বাউর’ শব্দ থেকে বাউল শব্দটি এসেছে যার অর্থ হল বায়ুবিকারগ্রস্ত। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উন্মাদাচন্দ্রের উপাসনাকারী সম্প্রদায় হল বাউল। অন্যভাবে বলা যায় যে, ভাবের ক্ষ্যাপাই হল বাউল। সে যুগে ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা ও বাহ্যিক ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তিকে বাউল বলা হত। বাউল শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’ কাব্যে এবং বৈষ্ণবীয় কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘ চৈতন্য চরিতামৃত’ গ্রন্থে। ‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’ কাব্যে বলা হয়েছে-

“ মুকুল মাথার চুল ন্যাংটা যেন বাউল

রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।’’

আবার ষোড়শ শতকের শেষ পাদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ গ্রন্থের অন্তলীলায় রাধা ভাবুদ্যতিম কৃষ্ণ সুবলিত চৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য ভাবোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে যে উক্তি করেছেন তার মধ্যদিয়ে বাউলের একটি সাধারণ স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। তিনি বলেছেন-

“ বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।

বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।

বাউলকে কাযে নাহিক আউল।

বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।’’

সুতরাং আমরা সচেতন দৃষ্টিকোণ থেকে বাউল শব্দটির প্রয়োগ দেখে বলতেই পারি যে, বৈষ্ণব কবিরা মাধবের চরণ লাভের অভিলাষে ষড়ৈশ্বর্য পরিহার করে হয়েছিলেন উদাস পথের পথিক। সুতরাং তাঁরাও ছিলেন ভাবের ক্ষ্যাপা- যা বাউলদের প্রধান লক্ষন।

‘বাউল’ সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাথমিক ভাবে দুটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে, প্রথমতঃ পঞ্চ উপাসনার দেশে বাউল ধর্মের উদ্ভবের কারণ কী ? দ্বিতীয়তঃ বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব কোন্‌ সময়ে হয়েছিল ? উত্তর স্বরূপ বলা যায় যে, ব্রাহ্মণ ধর্ম আচার সর্বস্ব ধর্ম সমগ্র সমাজকে রাহুর মতো গ্রাস করে ফেলেছিল। সাধারণ অন্ত্যজ মানুষের জীবনে বঞ্চনা, অনাচার, অত্যাচার, বর্ণবৈষম্য জাতিভেদ প্রথার অমানিশা নেমে আসে। শূদ্র শ্রেণীর মানুষের দেব ভূমির কোন মন্দির বা মসজিতে স্থান হয়নি। সমাজে তারা অপাংক্তেয় বলে আচার সর্বস্ব ধর্ম থেকেও বিতাড়িত হয়। এই সাধারণ মানুষ সমাজের কৌলিন্যতা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর খুঁজতে থাকে হৃদয় ধর্মকে, প্রকৃত মানব ধর্মকে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি কথা মনে পড়ে যায়--

“ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্র বর্জিতা

ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তার আপন স্থানে

সকল বেড়ার বাইরে

সহজ ভক্তির আলকে…’’

চৈতন্য মহাপ্রভুকে বাউল সম্প্রদায় তাঁদের আদি পুরুষ বলে মনে করেন। কিন্তু মননশীল মন নিয়ে বিস্লেষন করলে দেখা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুর্কি, মোঙ্গল, পাঠান আক্রমণের পর একদল উদারপন্থী, মানবতাবাদী সূফী সাধক বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করার সময় সেই সমস্ত গ্রামের অন্ত্যজ, অপাংক্তেয় মানুষদের তাদের ভাষায়, তাদের মনের কথা এবং সহজ- সরল ধর্ম কথা শোনায়। যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক অন্ত্যজ মানুষ সেই সমস্ত ফকির বাউলদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাউল সম্প্রদায় চৈতন্যদেবকে আদি প্রান পুরুষ বলে মনে করেন। অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সাথে সাথে বাউল ধর্ম তার পূর্ণ অবয়ব নিয়ে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভবের সময়কাল প্রসঙ্গে এ কথা বলার অবকাশ থাকে না যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলমান আক্রমণের পর ঐসলামিক ধর্মের সহজিয়া উদারপন্থী সূফী সাধক সম্প্রদায়ের হাত দিয়ে বাউল সম্প্রদায়ের প্রাথমিক নির্মাণ কার্য শুরু হয়। পরবর্তীকালে এই সহজিয়া উদারপন্থী সূফী ভাবনার সাথে মরমিয়া বৈষ্ণব ভাবনার সংমিশ্রণে বাউল ধর্মের অবয়ব নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছিল।

বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পূর্বে সমসাময়িক সময়ে বা কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে সমগোত্রীয় বেশকিছু ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। যেমন আউলিয়া ফকির,ন্যড়া সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি। প্রকৃত পক্ষে এই সম্প্রদায়গুলি ছিল বাউল সম্প্রদায়েরই বিভিন্ন রূপ। কারণ এই সম্প্রদায় গুলির পোষাক- পরিচ্ছেদ, ভাবের খেলায়, কায়া সাধনা এবং সাধন প্রণালীর সাথে বাউলের নিবিড় সংযোগ আছে। এছাড়াও উল্লেখিত সম্প্রদায় গুলির মতোই বাউল ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট হল গুরুতত্ত্ব। কারণ বাউলরা মনে করেন গুরু হল দেবতার সমতুল্য। তিনি অন্ধব্যক্তির চোখে জ্ঞানের কাজল পড়িয়ে অজ্ঞানতা দূর করেন। গুরু তাঁদের কাছে হল জীবনের অন্ধকার দূর করে জ্ঞান প্রজ্ঞার আলোতে উদ্ভাসিত করেন যিনি। তবে তাঁদের নির্দিষ্ট কোন শাস্ত্র পুঁথি নেই। গুরু শিষ্য পরম্পরায় পাওয়া গান ও রীতির মাধ্যমে তাঁরা ধর্মাচারণ করতেন। বাউলদের সেই ভজন হল রসের ভজন। সেখানে মনের মানুষের অন্বেষণ ধূ ধূ মরুপথে হয়না, সহজ সরল ভাবরসের উদ্বেলিত স্রোতেই বয়ে চলে বাউলদের ভাবের তরী।

বাউলরা নারী দেহকে মুক্তির সোপান বলে মনে করতেন। তাই তাঁরা লোকালয় থেকে দূরে আশ্রম বা আখড়া তৈরি করে মনের আনন্দে বাউল রসের ভজন করতেন। বাউলদের ধারনা নারী দেহের মধ্যে ‘সহজ মানুষ’ ‘মনের মানুষ’ এবং ‘অধরচাঁদ’ বিরাজমান। তাই বাউলরা তিনদিন ধরে ত্রিবেণীর ধারে বসে মৎস্য শিকার করেন। তাঁদের বিশ্বাস ত্রিবেণীর ধারা মিলিত হলে চতুর্থ দিনে পাওয়া যায় মনের মানুষকে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে- “ স্ত্রী ধর্মের বিশেষ দিনে স্ত্রী পুরুষের বিশেষ দৈহিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সঙ্গত হইলে বাউল সাধনার সিদ্ধি নিকটর হইবে।’’ বাউল সম্প্রদায়ের বাউলানীর ভূমিকা প্রসঙ্গে পাঞ্জশাহ বাউলের বিশেষ একটি গানের লাইন মনে পড়ে- ‘মেয়ে ভজতে পারলে পারে যাওয়া যায়’।

বাউলরা উদারনৈতিক মানবতাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁরা ধর্মীয় গোঁড়ামি, ধর্ম বৈষম্য, জাতিভেদ ভুলে মহামানবের মিলন তীর্থে উপনীত হতেন। হিন্দু গুরুর যেমন রয়েছে মুসলমান শিষ্য, তেমনি রয়েছে মুসলমান ফকিরের হিন্দু শিষ্য। তবে প্রাসঙ্গিক ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিন্দু বাউল অপেক্ষা মুসলিম ফকিরদের গানে সমন্বয় সাধনের প্রবণতা অধিকমাত্রায় দেখা গিয়েছে। এর কারণ হল ত্রয়োদশ শতকের মুসলিম আক্রমণের পর অনেক হিন্দু উদারপন্থী সুফিবাদের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে ফকির সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। তাই হিন্দু বাউল অপেক্ষা মুসলমান ফকিরদের গানে ধর্ম বিষয়ক সমন্বয় সাধনের পিপাসা লক্ষ্য করা যায়।

বাউল সাধকরা শুধুমাত্র গানের জন্য গান বাঁধেন নি। তাঁদের এই গান সাধনার ইঙ্গিত বহন করে। বাউলদের বিশ্বাস প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই ‘মনের মানুষ’ ও ‘অধরচাঁদ’ আছে যাকে ইন্দ্রিয়াত্মক বস্তুজগতের মধ্যে ধারণ করা যায় না, এই অধরচাঁদ একাধারে বিশ্বদেবতা ও জীবনদেবতা। ইনি ‘অচিন পাখি’। বাউল সাধকেরা এই অচিন পাখিকে হৃদয় পিঞ্জরে ধরতে চান, কিন্তু পারেন না। বাউল সাধকদের ধারণা, এই অচিন পাখিকে আবিস্কার ও জীবদেহে তাকে উপলব্ধি করতে পারলেই বাউলদের মুক্তি লাভ ঘটে। তখন বাউল সাধকরা পার্থিব সত্ত্বাকে ত্যাগ করে ঈশ্বর সত্ত্বায় মগ্ন থাকেন। সীমাবদ্ধ জড় সত্ত্বাকে বিনাশ করে দেহ ও মনে মুমুক্ষু হয়ে ওঠাই বাউল সাধনার মূল কথা। তাঁরা মনের মানুষের সন্ধান করতে গিয়ে বাস্তবিক পূজার্চনা, রোজানামাজ, মন্দির মসজিত, কাশী –কাবা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে ওঠেন। এমন কি মানুষের মধ্যে যে ধর্মীয় ভেদাভেদ তাকেও তাঁরা অস্বীকার করেন। মন্দির মসজিতকে তুচ্ছ করে বাউল সাধকেরা বলেন –

“ তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিতে

তোমার ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই

রুইখা দাঁড়ায় শুরুতে মুরশেদে।’’

বাউল সাধকদের বিশ্বাস যে, আত্মতত্ত্ব না জানলে সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। এই আত্মতত্ত্বকে জানতে হলে খুঁজে পেতে হবে মনের মানুষকে। যে বস্তুকে পার্থিব জগতে পাওয়া অসম্ভব সেই মনের মানুষের সন্ধান পাওয়াই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সব সময় তাঁরা নির্জনে বসেই মনের মানুষের সাধনা করতেন –

“ আছে হেথায় মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা

অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা।

কাছে রয় ডাকে তারে উচ্চস্বরে কোন পাগলা।’’

এই গান থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে, বাউল সাধকরা সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে ভগবানেরই দর্শন পেতে চেয়েছেন। ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারলেই বাউলদের সীমাবদ্ধ সত্ত্বার বিনাশ ঘটে এবং অসীমের সঙ্গ লাভ করতে পারেন।

পার্থিব জগতের সমস্ত লোভ- লালসা ত্যাগ করে বিশুদ্ধ মনোমার্গে পৌঁছানো এবং স্থুল দেহমার্গেও রহস্যময় অনুশীলনের দ্বারা তাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাই বাউল সাধকদের জীবনের একমাত্র আদর্শ। বাউল সাধকদের মুক্তির জন্য যে সাধন পদ্ধতি ছিল সেটা অবাউলদের জানানো নিষেধ ছিল। বাউলরা নিত্য চোখে দেখা, বা প্রয়োজনীয় বস্তুকে কেন্দ্র করেই গান রচনা করতেন। কিন্তু সেই সমস্ত গানের মূল অর্থ ছিল আলাদা। বাস্তব জগতের যা কিছু সহজলভ্য তাকে নয়, যা কিছু দুর্লভ তাকে পাওয়াই বাউল সাধকদের মূল সাধনা। চর্যাপদের মধ্যে যেমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক, এই দুটি মানে পাওয়া যায়, বাউল গানকেও গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যেও দুটি মানে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন এরকম একটি গানে বাউল সাধক বলেছেন-

“ মন যদি চড়বি রে সাইকে।।

আগে দে কপানি এঁটে অকপটে সাচ্চা কর দেল।।

ফুটপিনে দিয়ে পা হপিং করে এগিয়ে যা

পিনের পড়ে ওঠে দাঁড়া বেদবিধি হবি ছাড়া

সামনে কর নজর চড়া আগাগোড়া ঠিক রাখিস হ্যান্ডেল।’’

এই গানে যে সাধারণ অর্থ পাওয়া যায় সেটা বাউলদের গানের অর্থ নয়। ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর মধ্যে আছে দেহতত্ত্ব মূলক কথা যার সাহায্যে বাউল সাধকরা মুক্তির পথ খুঁজে।

বাউল সাধকরা দিনের পর দিন অচিনপাখির সাধনা করেছেন। তাঁরা মুক্তি লাভের উপায়কে খুঁজে বেড়ান কিন্তু সে মুক্তি তো তাঁদের অন্তরের। এই মুক্তিকেও বাইরে প্রকাশ করা তাঁদের সম্ভব ছিল না। এর ফলে তাঁদের অধিকাংশ গানগুলোতেই রয়েছে না পাওয়ার একটা গভীর যন্ত্রনা ও আক্ষেপ। যেমন –

“ মিলন হবে কত দিনে

আমার মনের মানুষেরও সনে।’’

আসলে বাস্তবে যাকে পাওয়া সম্ভব নয় তাকেই পাওয়ার সাধনা যাঁরা করেন তাঁদের কাছে এরকম আক্ষেপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। বাউল সাধকেরা সব সময়ই সীমা- অসীমের এবং জীবাত্মা- পরমাত্মার সম্পর্ককে ইঙ্গিতের সাহায্যে ব্যক্ত করতেন। বাউল সাধকেরা সাধারণত উপমার সাহায্যে গভীর অর্থকে প্রকাশ করতেন। মূলত তাঁরা বাউল সাধনার সংকেত দিয়ে গানগুলো রচনা করতেন।

বাউল সাধকদের জীবন সাধারণত সংসার বন্ধনের বিপরীত স্রোতে সব সময় চালিত হত। ফলে বাউলরা সংসার ত্যাগ করে উদার মাঠ, খোলা আকাশ, নির্জন আশ্রম প্রভৃতি স্থানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। বাউলরা ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। এ কারণেই মনুষ্য সমাজে তাঁরা বিশেষ সম্মান পায়নি। বাউল সাধকদের কাছে জাতের বিচার নয়, সবাই মানুষ এটাই ছিল তাঁদের মানবতাবাদ। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বাউল সাধকরা বাহ্যিক ব্যাপারে উদাসীন থেকে ঈশ্বর প্রেমে বেশি মেতে থাকতেন।

স্বল্প পরিসরের এই আলোচনায় সমস্ত বাউল সাধকদের কথা আলোচনা করা সম্ভব না হলেও জগতখ্যাত বাউল লালন ফকির ও তাঁর বিশেষ কয়েকটি গানের মাধ্যমে সমগ্র বাউল সম্প্রদায়ের জীবন দর্শনকে আলোকপাত করা যেতে পারে। কেননা বাউল সম্প্রদায় যেহেতু স্বতন্ত্র একটি দল, তাই লালন ফকির ও তাঁর গানে বাউল সাধকদের চিন্তা- চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে। কেউ কেউ অনুমান করেন ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে কুষ্ঠিয়ার কুমারখালি গ্রামের নিকট ভাঁড়রা গ্রামে হিন্দু কায়স্থ বংশে তাঁর জন্ম। বিবাহের পর তীর্থ করতে গিয়ে অসুস্থ হন। এক মুসলিম দম্পতি তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। এরপর তিনি ফকির ধর্ম গ্রহণ করেন এবং লালন শাহ্‌ ফকির নাম ধারণ করেন। তবে কোন রীতি পদ্ধতি মেনে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি বলেই মনে হয়। কেননা তিনি জাতপাত হীন বাউল ও ফকির ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এর ফলে এক সময় সমাজে প্রশ্ন ওঠেছিল লালনের জাত নিয়ে। এর উত্তরে লালনের গান ছিল-

“ সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবন।

লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।’’

অথবা

“ সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।

লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।’’

লালন ফকিরের কাছেও কোন জাতপাতের বিচার ছিল না, কেননা তাঁর ধারণা ছিল যা মানুষ সৃষ্টি করতে পারি না তার বিচার করার কোন অধিকার মানুষের থাকতে পারে না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালন ফকিরের বাউল গানের সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মূলত তার ফলেই এই অজ্ঞাত অপরিচিত বাউল সাধক লালন ফকির আজ গোটা বাঙালি জাতির কাছে পরিচিত।

লালন ফকির জীবদেহে আত্মার খোঁজ করতেন। কিন্তু এই আত্মা কি বাস্তবে দেখা বা ধরা সম্ভব ? না পেয়ে তবুও পাওয়ার আশায় ব্যকুল হয়ে থাকতেন। লালন ফকির যে অচিনপাখির কথা বলেছেন সেতো আসলে জীবের আত্মার কথা বলা হয়েছে। এই আত্মা জীবদেহে কিভাবে প্রবেশ করে কিংবা কিভাবে বেরিয়ে যায় তা কেউ বলতে পারেন নি, এমন কি বাউল সাধকরাও না। লালন ফকির তাঁর একটি গানে বলেছেন-

“ খাঁচার ভিতর অচিনপাখি কম্‌নে আসে যায়।

ধরতে পারলে মন- বেড়ি দিতাম তাহার পায়।

আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা

মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা

তার উপরে সদর কোঠা

আয়না মহল তায়।’’

শেষে একথা স্বীকার করতে হবে যে, লালন ফকির ও অন্যান্য বাউল সাধকদের জীবন যাপন প্রণালী প্রায় একই রকমের ছিল। কেউ বা আশ্রমে, কেউ বা উদার প্রান্তরে নির্জনে বসে সাধনা করতেন। অর্থাৎ যাকে পাওয়া সম্ভব নয়, তাঁকে পাওয়াই যেন সকল বাউলদেরই উদ্দেশ্য।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে বলা যায় যে, বাউলদের সমাজে না ছিল কৌলিন্যতা, না ছিল আত্মমর্যাদা। তাই তাঁদের গানকে প্রথম দিকে চাষার গান বলে বিদ্রুপ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বাউল সম্প্রদায়কে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি গোচর করান। তার পর থেকেই লালন ফকির, পূর্ণদাস বাউল, নবনী দাস, সুখচাঁদ শেখ, শাহানশা রুকির প্রমুখ প্রসিদ্ধ বাউল শিল্পীদের হাত ধরে বঙ্গের সীমারেখা পার হয়ে পাশ্চাত্য দেশ গুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে বাউল গান। বিশ্বায়নের সাথে সাথে যদিও বাউলদের জীবন ভাবনা ও গানের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটেছে তবুও বাউল সম্প্রদায়ের গানগুলো কানের মধ্যে ঝংকৃত হলে আমরা রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুধাবন করি বঙ্গদেশের কোমল হৃদয় ভাবনায় সিক্ত মাটির সোঁদা গন্ধ।

তথ্যসূত্রঃ

১। চাকী, লীলা, রবীন্দ্রনাথ ও বাউল, পুস্তক বিপণি, ২০১১ ।

২। প্রামানিক, ডঃ সঞ্জয়, বাউল গানের তত্ত্বকথা ও ভাষা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১২ ।

৩। চক্রবর্তী, সুধীর, বাংলা দেহতত্ত্বের গান, পুস্তক বিপণি, ১৯৯০ ।

৪। দেবদাস, সুপ্রতীপ, লালন ফকিরের গান (প্রথম খণ্ড), সংবর্ত প্রকাশনী, ১৪০২ ।

৫। ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, বাংলার বাউল ও বাউল গান,মডার্ন প্রকাশনী, ২০০২ ।

জীবনানন্দ দাশের বোধঃ মানসিক স্বপ্ন ভঙ্গের কবিতা

অমিত ধাড়া

যে-কোনো সৃষ্টিকর্মের মূলেই থাকে একটি প্রেরণা। তবে সে প্রেরণা কখনই আকাশ কুসুম হতে পারে না। শিল্পীর সামাজিক পরিবেশ, জাতিগত ও দেশজ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার এবং মানসিকতার বিশেষ গঠন মিলে সেই প্রেরণার জন্ম হয়। প্রেরণাক্ষণ থেকে সৃষ্টিকর্মের উৎসারণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি কিন্তু চালিত হয় কবির সচেতন মনের নিয়ন্ত্রিত ভাবনার সাহায্যে। সেই সচেতন মনের নিয়ন্ত্রিত ভাবনার ফসল কবি জীবনানন্দ দাশের ‘বোধ’ কবিতা। কবির সৃষ্টির প্রেরণার সূত্রে একটি কবিতা মনে আসে -

‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,

কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে’ \_\_ কুসুম কুমারী দেবী (আদর্শ ছেলে)

এই অতি পরিচিত পংক্তি আদর্শ ছেলের আদর্শ মা কুসুম কুমারী দেবীর নির্মাণ। বলতে দ্বিধা নেই কবি জীবনানন্দ ন্যায়, নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের স্বপ্ন নিয়েই বড় হয়েছিলেন। আসলে এ-সবই কবির জন্মসূত্রে পাওয়া। কিন্তু সেই সময়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা, সামাজিক পরিস্থিতি, রণহিংসা এবং চারিদিকে বিশ্বাসহীনতা কবিকে বিশেষ ভাবেই অস্থির করে তোলে। যে ন্যায়-নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের স্বপ্নে কবি বড় হয়েছিলেন, বাস্তবে সেই স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই রকম এক স্বপ্ন ভঙের কবিতা ‘বোধ’ ।

আধুনিক কাল চেতনার প্রসঙ্গটি জীবনানন্দের কবিতায় বার বার উঠে এসেছে। আধুনিক কবি এলিয়ট ও জীবনানন্দ – দুই জনই সময় সচেতন কবি। কাল চেতনা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ বলেছেন--- “ মহাবিশ্ব লোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময় চেতনা আমার কাব্যে সঙ্গতি সাধক অপরিহার্য সত্যের মতো---।” (কবিতা প্রসঙ্গে, কবিতার কথা), আসলে জীবনানন্দ দাশ আত্মিক বোধের অন্তর্গত সময় চেতনার কথা বলেছিলেন আর এলিয়ট বলেছিলেন সময় ঐতিহ্যের কথা। এই আত্মিক বোধের সময় চেতনায় ‘বোধ’ কবিতার জন্ম। ‘বোধ’ কথাটির অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান। অর্থাৎ এই বোধ কেবলমাত্র চেতনা সম্পন্ন মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করে। কারণ যার চেতনা আছে তাঁরই হৃদয়ে বিশেষ জ্ঞান জন্মনেয়। কবি জীবনানন্দ একজন চেতনা সম্পন্ন আধুনিক মানুষ যার মধ্যে বোধের উপলব্ধি ঘটেছে। এই জাগ্রত ‘বোধ’ কবি কে সমাজ সংসার বিছিন্ন করেছে। প্রাত্যহিক জীবনের চাওয়া-পাওয়া গুলি আজ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। কবি নিজ জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন সাধারণ মানুষ সারা জীবন ধরে সুখের উপকরণ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। আসলে সুখের ঠিকানায় পৌছানো ‘অনেক যুগের মনিষীর কাজ’। এই চেতনাই ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কাব্য ও কবির ব্যক্তি জীবনকে ধূসরময় করে তোলে।

‘বর্ষা আবাহন’ কবিতার মধ্যেদিয়ে যিনি আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁরই হাতে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ ঝরা পালক’ আমরা পেলাম। এরপর ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কাব্যের প্রকাশ । একটু খেয়াল করলে বোঝা যায় নাম কবিতা গুলির ভাষা আস্তে আস্তে বদলে যাছে। এই পরিবর্তনের পিছনেও কবির বোধ জাগ্রত। আসলে ব্যক্তি জীবনানন্দ এই সমাজ থেকে নানা ভাবে বঞ্চিত ও যন্ত্রনাবিদ্ধ হচ্ছিলেন। পাশ্চাত্যের দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ড ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছিলেন— “Kierkgard was especially aware of the burden and mystery of one’s individual existence to one self----- it was from the extreme lonelincss. And perhaps from the over-scruplousness of his religious life that his emphasis on dread, awe and anxiety(he has little, i am afraid to say about joy) springs. In a sense he represents a genuine religious attitude, but a crippled one.”(The Modern Writer and his World: G.S.Fraser)।

জীবনানন্দের ব্যক্তি জীবন বা কর্মজীবন কোনো সুখের স্মৃতি বহন করে আনেনি। ব্যক্তি জীবন সর্বদাই সংকটের মধ্যে দিয়ে কেটেছে আর কর্মজীবনে বার বার পড়েছে ছেদ। কারণ অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে বাঁচার শিক্ষা তাঁর ছোটবেলা থেকেই ছিল না। শিক্ষিত মানুষের ভয় প্রদর্শন আর চাতুরি দিয়ে পৃথিবীকে গ্রাস করার মানসিকতায় কবি অস্তিত্ব বার বার বিপন্ন হয়েছে। এই অস্তিত্ব বিপন্নের প্রসঙ্গে জি. এস.ফ্রেজার বলেছেন— ‘For the existen tialists, then we are not merely living through period of crisis, but human existence it self is, in it’s very nature, a permanent crisis’ (The Modern Writer and his World: G. S. Fraser)।

আলো- অন্ধকারের দোলাচারতায় কবির মনে এক বিস্ময় বোধ জন্ম নিয়েছে। আর এই বোধ-ই কবি স্থির থাকতে দিচ্ছে না-----

‘ আলো-অন্ধকারে যাই মাথার ভিতর

স্বপ্ন নয়—কোন এক বোধ কাজ করে ;

স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,’

এই বোধ—স্বপ্ন থেকে, শান্তি থেকে ও ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন। মানুষের বাঁচার ও চালিত হবার সব পথ রূদ্ধ করে কবি হৃদয়ে বোধ জাগ্রত হয়েছে। মানুষের বাঁচার নূন্যতম চাওয়া-পাওয়া গুলি আজ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তাই কবি হৃদয়ে সর্বদা শূন্যতা বিরাজ করে---

‘সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়

শূন্য মনে হয়

শূন্য মনে হয়।’

নয়টি স্তবকে ১০৮ পঙক্তির মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের কবিতা এই ‘বোধ’। মানুষ স্বপ্নে বাঁচে, কবিও আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো করে জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কবির জাগ্রত চেতনা তাঁকে সবার থেকে আলাদা করেছে। অনেক চেষ্টা করেও কবি সবার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারছেন না। সে জন্য কবি হৃদয়ের ব্যর্থতার হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে এই স্তবকে—

‘শরীরে মাটির গন্ধ মেখে

শরীরে জলের গন্ধ মেখে

উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে

চাষার মতন প্রাণ পেয়ে

কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর পরে ?’

এক জন চেতনা সম্পন্ন মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার মধ্যেকার অস্থিরতা, জ্বালা ও যন্ত্রনা কবি প্রতিনিয়ত অনুভব করেন। কারণ বর্তমান সময়ের মানুষ অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে দিন যাপন করে চলেছে। কবি নিজেকে এই সব মানুষ জনের সঙ্গে মেলাতে পারছেন না। কারণ কবির এখন চেতনার ছায়া সঙ্গী হয়েছে আলো-অন্ধকারে গড়ে ওঠা মগ্ন চৈতন্য। কবি এই চেতনার অনুভবময়তা থেকে নিজে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। গণ্ডিবদ্ধ জীবনের চেনা জানা ছক থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছেন—

‘তবু সে মাথার চারিপাশে,

তবু সে চোখের চারিপাশে,

তবু সে বুকের চারিপাশ,’

‘তবু’ অব্যয়টি ব্যবহার করে কবি বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকার অবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই আত্ম নিমগ্ন অবস্থা কবিকে সমাজ সংসার আত্মিয় পরিজন সবার থেকে আলাদা করে দিয়েছে-

‘সকল লোকের মাঝে ব’সে

আমার নিজের মুদ্রাদোষে

আমি একা হতেছি আলাদা ?’

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ বড় বেশি হিসাবী, বড় বেশি মেকী। সভ্য মানুষের চোখে লাগানো রোদ চশমায় সমস্ত কিছু রঙিন হিসাবে ধরা দেয়। তাই সমাজের ঘটে যাওয়া অঘটন গুলি তাদের মনে তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনা। এ প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী তাঁর ‘চেতন স্যাকরা’ কবিতায় বলেছেন-

‘গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,

সোনার সুন্দর, রূপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে

“ধ্যান বানাই”

কবি অমিয় চক্রবর্তী নোংড়া গলিতে যে ধ্যানের সাধনা করেছেন জীবনানন্দের মনেও সে সাধনা ছিল এক দিন কিন্তু আজ চেতনার গভীর স্তর সে বাসনা থেকে তাঁকে আলাদা করেছে। কারণ কবির আদর্শ ও মূল্যবোধ যেখানে বিপন্ন সেখানে বাসনা থাকে কি করে? তাই কবি এ সমাজে একা এবং আলাদা। কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসাবে কবি আর পাঁচজন মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। যে সমস্ত মানুষ শুধু মাত্র বেঁচে থাকা আর সন্তানের জন্ম দিয়েই পরম আনন্দে জীবন অতিবাহিত তাদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে গিয়ে বলেছেন—

‘ তাদের হৃদয় আর মাথার মতন

আমার হৃদয় না কি ? তাহাদের মন

আমার মনের মতো নাকি ?’

কবি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের পথচলা ও তাদের মধ্যেকার নিরব জীবন যাপনের মধ্যে সত্যিকারের সুখ, শান্তি ও আনন্দ আছে কি না ? লুকিয়ে আছে কি না বেঁচে থাকার গভীর কোনো রহস্য। সে জন্য কবি ব্যক্তি জীবনে সে অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেয়েছেন—

‘ হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল ?

বালটিতে টানিনি কি জল ?

কাস্তে হাতে কতবার যাইনি মাঠে ?

মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে

ঘুরিয়াছি ;’

এই সমস্ত অভিজ্ঞতা কবি বাতাসের মতো অগাধ সঞ্চয় করেছেন। কিন্তু কোনো কিছুর মধ্যেই কবি সেই নিবিড় শান্তি কে খুঁজে পাননি। কবি এই সমাজ থেকে ভালোবাসা ও প্রত্যাক্ষান দুই পেয়েছেন—

‘ আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,

আসিয়াছে কাছে,

উপেক্ষা সে করেছে আমারে,

ঘৃণা করে চ’লে গেছে – যখন ডেকেছি বারে-বারে

ভালোবেসে তারে ;’

জীবনানন্দ দাশ কামনীয় প্রেম- প্রণয় ও নারী সমস্ত কিছুর মধ্যেই ডুব দিয়ে দেখেছেন। কিন্তু সেখানেও বোধের কারণে প্রকৃত শান্তি পাননি। তাই কবি বলেছেন-

‘তবু এই ভালোবাসা- ধুলো আর কাদা’

আসলে কবি জীবনে উপেক্ষা, ঘৃণা ও প্রেমহীনতায় ভুগেছেন বার বার। যখনই কোনো কিছুকে ভালোবেসে কাছে পাবার চেষ্টা করেছেন তখনি প্রবল আঘাত পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ‘ বনলতা সেন’ কবিতার নায়িকার উপেক্ষার বাণি স্মরণ করা যায় – ‘এত দিন কোথায় ছিলেন ?’ যাকে পাওয়ার জন্য হাজার বছর ধরে কবির পথচলা। সেই স্বপ্ন সুন্দরী আবির্ভূত হয়ে এই রকম জিঙ্গাসা সূচকবাক্য সত্যিই বেদনা দায়ক কারণ এই বাক্যের মধ্যেই যে তাচ্ছিল্য, অবহেলা লুকিয়ে আছে। পাঠক হিসাবে সে কথা বুঝতে আমাদের খুব বেশী অসুবিধা হয় না।

এই মায়াময় সমাজ- সংসার, প্রেম-ভালোবাসা ও আত্মিক সম্পর্কের সব বন্ধন ছিন্ন করে কবি হৃদয়ে বিরাজ করছে বোধ। এই বোধ থেকে ব্যক্তি কবি মুক্তি প্রার্থনা করেন-

‘সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!

অবসাদ নাই তাঁর ? নাই তার শান্তির সময় ?

কোনোদিন ঘুমাবে না ?’

আসলে জাগ্রত চেতনা কোনো ভাবেই তাঁকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। কবি কিছু সময়ের জন্য এই চেতনার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন – ‘ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ / পাবে না কি?’ কবি আবার সন্ধিহান এই যে হয়তো এই বোধ মানুষ- মানুষী ও শিশুদের মুখদেখেই জাগ্রত হয়। কবি রোমান্টিকতার পথ ত্যাগ করে বাস্তবের পথে এই বোধের মুখোমুখি হতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি এও জানেন এ বাসনা অতি বিলাস ছাড়া কিছু নয়। কারণ কবি মানেন মানুষের শরীরে সংক্রামক ব্যাধির মতো সভ্যতার কায়ায় মারন রোগের বাসা হয়েছে-

‘যেই কুঁজ – গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে

নষ্ট শসা- পচা চাল কুমড়ার ছাঁচে’

আসলে নষ্ট শসা ও পচা চালকুমড়া এই গুলি একটা ‘কমপ্লেক্স’। গভীর অভাব বোধ ও অস্বাভাবিক দোলাচালতা কবির হৃদয়ে সর্বদা প্রতীয়মান। আসলে এর পিছনেও কবির স্বপ্ন ভঙ্গের কাহিনি লুকিয়ে আছে। আসলে কবির ধ্যান, ধারণার ও চেতনার অপমৃত্যু ঘটেছে।

‘বোধ’ কবিতার উৎস জীবনানন্দের জীবন জিজ্ঞাসার প্রশ্ন চিহ্ন থেকে। এই কবিতার প্রতিটি পর্বে কবি হৃদয়ের দোলাচালতা প্রতীয়মান। বর্তমান সমাজ ও জীবনানন্দের জীবনভাবনা দ্বন্দ্ব বার বার এই কবিতায় উঠে এসেছে। ব্যক্তি কবির আদর্শ, মূল্যবোধ ও স্বপ্নময় জীবন চেতনা ও তার বাস্তব পরিণামের মধ্যেকার দূরত্ব কবিকে অস্থির করে তুলেছেন। কবি ভাবেন এক আর বাস্তবে ঘটে অন্য রকম। কবির যে মহান আদর্শ মূল্যবোধের স্বপ্ন নিয়ে বড় হয়েছিলেন। বর্তমান সময়, পরিস্থি্তি ও সমাজ একেবারে ভিন্ন আদর্শে ভিন্ন পথে চলতে থেকেছে। কবি এই দুই সত্ত্বার অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে পড়ে সর্বদা ঘুরপাক খেয়েছেন। বর্তমান সমাজে কবির স্বপ্নময় চেতনা বার বার বিপন্ন হয়েছে। সেক্ষেত্রে কবির সচেতন মনের নিয়ন্ত্রিত ভাবনায় ‘বোধ’ কবিতার ভাবনা জাগ্রত হয়েছে। এ ভাবনা আদতে একজন সমাজ সচেতন মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গের কাহিনি। স্বভাবতই ‘বোধ’ জীবনানন্দের এক মানসিক স্বপ্ন ভঙ্গের কবিতা হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থ ঋণ

১। চক্রবর্তী, সুমিতাঃ আধুনিক কবিতার চালচিত্র, সাহিত্য লোক।

২। চক্রবর্তী,সুমিতাঃজীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল, ১৯৮৭।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্তঃ আমার জীবনানন্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৪। মাইতি, প্রকাশঃ জীবনানন্দ দাশের কবিতার শৈলীবিচার ও পাঠ বিশ্লেষণ, সাহিত্য সঙ্গী।

৫। মিত্র, মঞ্জুভাষঃ আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরপীয় প্রভাব, দে’জ পাবলিশিং,

৬। মুখোপাধ্যায়, বাসন্তীকুমারঃ আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, ১৯৯৪, প্রকাশ ভবন, কলকাতা,

৭। রুদ্র, সুব্রত( সম্পাদিতঃ জীবনানন্দঃ জীবন আর সৃষ্টি, ১৯৯৯, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা,

৮। মাইতি, প্রকাশঃ জীবনানন্দ এবং কয়েকজন কবি, ১৪০৯, আরামবাগ বুক হাউস, কলকাতা

বর্তমানে কেরীচারণা

শারদীয়া ভট্টাচার্য

২০১২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অতিক্রম করলেন দেড়শ’ বছর। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও। ২০১৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ। সাড়ম্বরে উদযাপিত হল তাদের সার্ধশতবর্ষ। মহান ব্যক্তিদের জুবিলি উদ্‌যাপনের এমনই রীতি হয়েছে আজকাল। তবে এমন সম্মানের উপযোগী বহু জ্ঞানী-গুণী জন কিন্তু থেকে যান প্রচ্ছন্নে। তাঁদের জীবনের বিশেষ ক্ষণটি আমাদের কারও নজরেও আসে না --- কিংবা আসলেও তা নেহাতই সীমায়িত পরিধির মধ্যে।

এমনই একজন হলেন বাংলা সাহিত্যের গদ্য সংরূপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বা পথিকৃৎ রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী। ২০১২ সালে তিনি অতিক্রম করে ফেলেছেন আড়াইশ’ বছর। আমাদের,অনেকেরই স্মরণে নেই সে কথা। সত্যি বলতে বর্তমানে সাহিত্যের ছাত্র বা অত্যুৎসাহী পাঠক কিংবা গবেষক ছাড়া আমাদের সকলেরই বিস্মৃতির প্রায় অতলে নিমজ্জিত হতে বসেছেন তিনি।

তবে কেরীকে নিয়ে চর্চা একেবারেই হচ্ছে না বা তাঁর সার্ধদ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপনও একেবারেই হয়নি— একথা বললে অবশ্যই ভুল হবে। তাঁর জন্ম সার্ধদ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনাচক্র, নানান অনুষ্ঠান। সারা বছরই এই উদ্‌যাপন চলেছে। কোলকাতা ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’তে ৮ফেব্রুয়ারি’২০১২ আয়োজিত হয় একটি সেমিনার। ২১ফেব্রুয়ারি ভাষাদিবসে বোলপুর-শান্তিনিকেতনের পিপিডি উচ্চ বিদ্যালয় আয়োজন করে ভাষায় কেরীর অবদান সংক্রান্ত একটি আলোচনার। আবার ‘এগ্রিহর্টিকালচার সোসাইটি’ এই অনুষ্ঠান পালন করে ঐ বছরেই ২৪মার্চ-এ। এদেশে পদার্পণের পর কেরী বেশ কিছুকাল উত্তরবঙ্গে বসবাস করেছিলেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা কলেজেও উদ্‌যাপিত হয় কেরী জন্ম সার্ধদ্বিশতবর্ষ। এইরকম বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানেই আয়োজিত হয়েছিল আলোচনাচক্র বা সেমিনার। উল্লেখের অবকাশ রাখে না শ্রীরামপুর কলেজেও এই উপলক্ষ্য পালন করা হয়েছে বেশ জাকজমক করেই। কলেজ ছাড়াও কেরীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয় শ্রীরামপুর পৌরসভাতেও। এমন আরও কিছু প্রতিষ্ঠানেও পালিত হয়েছে এই উৎসব, প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থ। তবে এই প্রসঙ্গে বলা দরকার এই উৎসব মূলত সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে সেইসব প্রতিষ্ঠানে যেখানকার সাথে কেরীর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। এবং এই উৎসবগুলি প্রধানত গণ্ডিবদ্ধ হয়েছে আলোচনাচক্রের মধ্যেই। এছাড়াও সার্বিকভাবে কেরীকে নিয়ে চর্চনা করছেন অনেক পণ্ডিতব্যক্তিই। কেরীচর্চা সংক্রান্ত আলোচনার বিস্তারে যাওয়ার আগে এক স্মৃতির স্মরণি বেয়ে চলে যাব কেরীর আমলে। মনে করে নেব তাঁর পরিচয়টি।

আদি থেকে পদ্যবাহিত বাংলা সাহিত্যে দলিল দস্তাবেজ বা পত্রাদি ছাড়া গদ্যের নিদর্শন তেমন মেলে না। এই রীতিই চলে আসছিল। এমত অবস্থায় ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি উইলিয়ম কেরী ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭৯৩ সালে ভারতের মাটিতে পা রাখেন।

কেরীর আগমনের কাল ছিল ভারতের বিপর্যস্তের সময়। বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে বদল। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, বহিরাগত দস্যু, বর্গীদের আক্রমণ, ব্রিটিশ কর্মচারিদের অত্যাচার প্রভৃতির প্রকোপে বাংলা ও বাঙালি ভাঙনের মুখে। এই বিশৃঙ্খল বাংলাতেই উইলিয়ম কেরীর আগমন।

বাংলায় এসে নানান কর্মযোগের মধ্যে দিয়ে কেরীর সময় অতিবাহিত হতে থাকে। ১৮০১ সাল নাগাদ উইলিয়ম কেরী দায়িত্ব পান ভারতে আগত ইংরেজ সিভিলিয়নদের বাংলা শেখাবার। খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত শ্রীরামপুর মিশনের কর্তৃত্বভারে থাকা উইলিয়ম কেরী বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যক্ষরূপে যান নব্যস্থাপিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে।

কেরী মনে করেছিলেন বাংলা শাসনকার্যের জন্য বাংলাভাষা শিখতে গেলে যেমন শেখা দরকার বাংলা ব্যাকরণ তেমনি প্রয়োজন বাঙালি সাধারণ সমাজের ভাষা রপ্ত করা। আর সেই তাগিদেই তিনি ব্যাকরণ গ্রন্থ ও ‘কথোপকথন’ রচনা (মতান্তরে সংকলন) করে ফেলেন। বাংলা সাহিত্যে পূর্বে স্বল্প অঙ্কুরিত গদ্যসাহিত্য কেরীর হাত ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। বাংলা গদ্যে কৃত্রিম সংস্কৃতানুগ ভাষার জায়গায় স্থান পেল কথ্যভাষা। এছাড়া কেরীর সংকলন গ্রন্থ ‘ইতিহাসমালা’, ৩৫টি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ, একাধিক ভাষায় অভিধান রচনা ও অনেক গ্রন্থ প্রকাশ কারও অবিদিত নয়। উইলিয়ম কেরীর এই পদক্ষেপ বাংলায় গদ্যসাহিত্যকে প্রসারিত করে বৈ কি।

এসব ছাড়াও রেভারেণ্ড কেরী আরও নানা ধরণের কাজ করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’, ‘এগ্রিহর্টিকালচার সোসাইটি’, হাসপাতাল ইত্যাদি। তাঁর উল্লেখযোগ্য আর একটি কর্মযজ্ঞ বাংলার নানাবিধ কুসংস্কার বিলোপ। শেষোক্ত প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় কেরী লাইব্রেরীর কিউরেটর শ্রীযুক্ত তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য—

“তখনকার দিনে কুষ্ঠরোগীকে পিটিয়ে হত্যা বা জ্যান্ত কবর দেওয়ার প্রথা ছিল। কেরী কলিকাতায় কুষ্ঠরোগীদের সেবার জন্য হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেন।...মিশনারীরা কেরীর নেতৃত্বে গঙ্গাজলি, বাণফোঁড়া, আত্মহনন বা জগন্নাথের রথের চাকায় প্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমে পুণ্য সঞ্চয়ের মতো সামাজিক কুপ্রথাগুলি প্রতিরোধের জন্য সর্বদা আন্দোলন চালিয়ে যান।

“১৮০২ সালে সাগরে শিশু বিসর্জন তাঁরই প্রচেষ্টায় নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রথম সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে সাফল্য আসে। তারপরই ১৮০৪ সালে সরকার সতীদাহ প্রথা সম্পর্কিত প্রথম পরিসংখ্যান পেশ করার জন্য কেরীকে ভার দেন। উক্ত প্রথা শাস্ত্রসম্মত কিনা তার প্রমাণপঞ্জি, মৃত্যুঞ্জয় রচিত শাস্ত্রীয় অনুশাসন বহির্ভূত পাণ্ডুলিপিসহ কেরী লর্ড ওয়েলেসলীর দরবারে পেশ করেন। তবে গভর্ণর স্বদেশে প্রস্থান করায় অনেকদিন বিষয়টা স্থগিত থাকে। ... রাজা রামমোহন রায় ১৮১৪ সালের পর কলিকাতায় আসেন। ... রামমোহন দীর্ঘদিন পরে বিষয়টা সরকারের কাছে উপস্থাপন করেন। কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোকও কেরী ও রামমোহনকে সঙ্গ দেন। রামমোহন নয়, কেরীর সর্বাধিক উদ্যমেই ১৮২৯ সালে ৫ই ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা আইন মোতাবেক নিবারণ করেন এবং ঐদিনই বিশেষ দূতের হাতে তার বাংলা ভাষার অনুবাদ করার জন্য কেরীকে পাঠিয়ে দেন। সেদিন রবিবার, তবুও বৃদ্ধ ধর্মযাজক সমাজকল্যাণকামী কেরী সারাদিন ধ’রে পরিশ্রম ক’রে আইনের বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করে নিজে গভর্ণরের হাতে তুলে দেন।”

(কেরী সাহেব ও তৎকালীন বঙ্গ তথা শ্রীরামপুর সমাজ/ পৃঃ ৬৪,৬৫)

বাংলার সাথে তথা এদেশের সাথে এভাবেই সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন কেরীসাহেব। তো গুণীজনেরা যে এমন মানবদরদী নবজাগরণের অগ্রপথিককে নিয়ে চর্চা করবেনই সেকথা বলাই বাহুল্য। এই আলোচনার বিস্তারে যাওয়া যাক কেরীর জন্মোৎসব প্রসঙ্গের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁদের নাম মনে হয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম ড. মীর রেজাউল করিম। এশিয়াটিক সোসাইটির আলোচনাচক্রে তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল— ‘কেরীর কথোপকথন’। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে বহু বিদ্বজ্জন কেরী সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন সকলের কাছে। যেমনঃ

ড. সরস্বতী মিশ্র – কেরীঃ ইংরেজী বাংলা অভিধান

ড. অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় – কেরী ও ব্যাকরণ

ড. ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় – উইলিয়ম কেরী ও সংস্কৃতচর্চা

ড. তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় – কেরী ও শ্রীরামপুর কলেজ

ড. চন্দ্রমল্লি সেনগুপ্ত – লোকককথার আলোকে কেরীর ইতিহাসমালা

ড. শতাব্দী দাস – উইলিয়ম কেরীর বিজ্ঞানভাবনা

ড. সন্দীপ সিন্‌হা – কেরী ও তাঁর সহযোগীরা

এই সকল অধ্যাপক ছাড়াও এই সেমিনারগুলিতে অংশগ্রহণ করেছেন নির্মল দাশ, পল্লব সেনগুপ্ত, পুষ্পজিৎ রায়, বরুণ কুমার চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, তৃপ্তি চৌধুরী সোহারাব হোসেন, অলোক রায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, সাইফুল্লাদের মতো অধ্যাপকমণ্ডলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসম্পাদক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা। এই নামোল্লেখ থেকে সহজেই ধারণা করা যায় বিদ্বজ্জনেরা বাংলার নবজাগরণের এই অগ্রপথিক কেরীকে নিয়ে যথেষ্ট চর্চা করেন।

এছাড়া উইলিয়ম কেরীর কিছু রচনা একত্রে প্রকাশ করে এশিয়াটিক সোসাইটি। এবং এখানকার Transaction নামক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয় কেরীর ১৮১১সালের একটি বক্তব্য।

এইভাবেই সার্ধদ্বিশতবর্ষে কেরীকে সম্মান জানিয়েছেন বাঙালি। তবে কেবল জন্মোৎসব পালনই নয়, সার্বিকভাবে উইলিয়ম কেরীকে নিয়ে সুপন্ডিতেরা নানান কাজ করেছেন বা করছেন। সম্প্রতি সাইফুল্লা, মীর রেজাউল করিম ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে কেরীর ‘কথোপকথন’। গ্রন্থটিই যে কেবল মুদ্রিত হয়েছে—তা কিন্তু নয়। গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ থেকে প্রাপ্ত পাঠভেদ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে এখানে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত কথোপকথনের অসম্পূর্ণ রূপগুলি এবং বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে সংকলিত কথোপকথন সংগ্রহ ক’রে তাদের তুল্যমূল্য বিচারের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ মুখবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। পণ্ডিত মহলে করুণা পাবলিকেশনসের এই সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থটি খুবই সমাদৃত হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি পুণর্মুদ্রিত হয়েছে ‘ইতিহাসমালা’ও। অবশ্য এর আগে ফাদার দ্যতিয়েন এই গ্রন্থ পুণর্মুদ্রিত করেন।

কেরীচর্চা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ড. সুরঞ্জন মিদ্দের নাম। উইলিয়ম কেরী ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা শ্রীযুক্ত মিদ্দের বিশেষ ভালবাসার বা পছন্দের বিষয়। সুতরাং তিনি যে এই ব্যাপারে ওতপ্রোত জড়িত থাকবেনই সে আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীরামপুর মিশনের ‘কেরী লাইব্রেরি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার’(CLRC)-এর প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বর্তমান কিউরেটর তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ এই প্রসঙ্গে অবশ্য কর্তব্য। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় কেরীকে নিয়ে রচনা করেছেন একাধিক গ্রন্থ, প্রবন্ধ। তাঁর উদ্যোগই CLRC-কে আরও সুন্দর ক’রে সাজিয়ে তুলেছে। আর শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তো গণিতের অধ্যাপক হয়েও অবসর গ্রহণের পর কেরী লাইব্রেরিতে কিউরেটর পদ পাওয়ার পর থেকেই কেরীকে নিয়ে নানান গবেষণা করে চলেছেন এবং রচনা করে চলেছেন প্রবন্ধ-গ্রন্থ। সংকলন করেছেন কেরীসংক্রান্ত বিদগ্ধজনের রচনামালা। কেরীর সার্ধদ্বিশতবর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনারগুলিতে তাঁর বক্তব্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ‘কেরী সাহেব ও তৎকালীন বঙ্গ তথা শ্রীরামপুর কলেজ’ গ্রন্থটি। এখানে যেমন উইলিয়ম কেরীর জীবন অঙ্কিত হয়েছে তেমনি তাঁর নানান জানা-অজানা কার্যাবলীর বিবরণ বিশ্লেষিত ও স্পষ্ট হয়েছে সকলের কাছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শক্তিব্রত ঘোষের ‘উইলিয়ম কেরীঃ সাহিত্য ও সাধনা’ অতি মূল্যবান একটি গ্রন্থ।

শ্রীরামপুর মিশন বা CLRC কেরীকে আজও কীভাবে স্মরণ করে সে বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে উল্লেখ করি মালদা জেলায় পুষ্পজিৎ রায় মহাশয়রা কেরীর স্মৃতিসৌধ স্থাপন করেছেন। সেখানে প্রতি বছর কেরীর জন্মদিন (১৭অগস্ট) উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। আমন্ত্রিত হন বহু জ্ঞানী-গুণী জন। কেরীকে স্মরণ করা হয় নানা উৎসবের মধ্যে দিয়ে। পণ্ডিতদের সুবক্তব্যে, আলোচনায় কেটে যায় মেলার দিন ক’টি।

এবার আসি শ্রীরামপুর মিশন ও CLRC প্রসঙ্গে। এখান থেকে সমানে প্রকাশিত হয়ে চলেছে নানা পত্রিকা, পুস্তিকা, গ্রন্থাবলী। প্রতি বছর এখানেও কেরীর জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয় জাঁকজমক করে। কেরী দিবস হিসেবে চিহ্নিত ১৭অগস্ট দিনটিতে এখান থেকে প্রকাশিত হয় একটি স্মারক পত্রিকা এবং আয়োজিত হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সকাল থেকে সারাদিন চলে এই অনুষ্ঠান। প্রভাতফেরি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, ফুটবল ম্যাচের ইত্যাদি আয়োজন করা হয়।

স্মারক পত্রিকাগুলির থেকেও অনেক কেরী-গবেষক বা কেরীপ্রেমীর নাম ও তাঁদের ঋদ্ধ রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। শৈলেশ মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার দাস, বহ্নিশিখা ঘটক প্রমুখেরা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

কেরী মিউজিয়াম ও লাইব্রেরিটিও শংসার অধিকারী। লাইব্রেরিতে সযত্নে রক্ষিত আছে কেরীর প্রায় সকল রচনা, প্রকাশনা, কেরীসংক্রান্ত বিভিন্ন রচনা, পত্র-পত্রিকা। মিউজিয়ামটিও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবিদার। সেখানে কেরীর হস্তাক্ষর, পত্রাদি, একাধিক ভাষায় লেখা বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠাগুলি সযত্নে সুশোভিত হচ্ছে। রয়েছে কেরীসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাবলী, চিত্রাবলী। সবমিলিয়ে মিউজিয়ামে ঢুকলে যেন দেখা পাওয়া যায় জীবন্ত উইলিয়ম কেরীর।

**আন্তর্জা্লে উইলিয়ম কেরীঃ**

আজ ইন্টারনেট, গুগ্‌ল, উইকিপেডিয়া ছাড়া বিশ্ব অচল। রান্নার রেসিপি থেকে চটজলদি পথনির্দেশিকা সবেতেই সহায় আন্তর্জালিক জগৎ। ঠিক তেমনি সাহিত্য-বিজ্ঞান যেকোনও বিষয়ে খোঁজ পাতলেই কল্পতরুর মতো টুপ করে সে সংবাদ দেয়। মোদ্দা কথা ইন্টারনেট আমাদের জানায় যেকোনও কিছুর বা যেকোনও কারও whereabouts. যা বাইরে বইয়ের দোকানে বা লাইব্রেরিতে গিয়ে জানা নিতান্তই সময়সাপেক্ষ, তা পলকেই পেয়ে যাই ইন্টারনেটে।

রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরীও ধরা পড়েছেন এই জালে। কেরীর জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত কয়েকটি ওয়েবসাইট ও লিঙ্কঃ

en.wikipedia.org/wiki/William\_Carey\_(missionary)‎

William Carey:

[www.christianitytoday.com](http://www.christianitytoday.com)

William Carey— wholesome words:

[www.wholesomewords.org/biography/biorpcarey.html](http://www.wholesomewords.org/biography/biorpcarey.html)

এছাড়া উইলিয়ম কেরীর কীর্তিসম্ভার একপলকে তুলে ধরা হয়েছে এখানেঃ

[www.wmcarey.edu/carey/links](http://www.wmcarey.edu/carey/links)

আবার এখান থেকেই বিস্তারিতভাবে উন্মুক্ত হয় আরও নানান দিকঃ

[www.wmcarey.edu/carey/bibles/translation.html](http://www.wmcarey.edu/carey/bibles/translation.html)

এখানে কেরী অনূদিত ও প্রকাশিত বাইবেল সংক্রান্ত তথ্যাবলী মেলে সহজেই। এছাড়াও আন্তর্জালে সংরক্ষিত আছে কেরীর একাধিক ভাষায় রচিত অভিধান। যা বাইরে বইয়ের দোকানে বা লাইব্রেরিতে গিয়ে জানা নিতান্তই সময়সাপেক্ষ, তা পলকেই পেয়ে যাই ইন্টারনেটে।

জর্জ স্মিথ-এর ‘The life of William Carey’-এর লিঙ্কঃ

[www.wmcarey.edu/carey/gsmith.smith.html](http://www.wmcarey.edu/carey/gsmith.smith.html)এছাড়া http://www.wmcarey.edu/carey/electronic-books/articles/wc-journalism.pdf এই লিঙ্কটিতে পাওয়া যায় The Writings of William Carey: Journalism as Mission in a Modern Age.

উইলিয়ম কেরীকে নিয়ে চিত্রপরিচালক টনি ডিউ তৈরি করেছিলেন তথ্যচিত্র ‘ A Candle in the Dark: the Story of William Carey’. এ সম্পর্কে উল্লেখিত লিঙ্কটিঃ [www.imdb.com/title/tt1316049](http://www.imdb.com/title/tt1316049)

শুধু এই ক’টিই নয় আরও অনেক ওয়েবসাইট আমাদের ঋদ্ধ করেছে উইলিয়ম কেরী সম্পর্কে।

আলোচনার ছেদ টানার সময় বলি কেবল বইয়ের পাতায় বা সাহিত্যপাঠক্রমে কিংবা সীমায়িত প্রতিষ্ঠানে ও কেবল গুণীজনদের আগ্রহে উইলিয়ম কেরীকে গণ্ডিবদ্ধ না রেখে আমরা সকলেই যদি তাঁর আসন পাতি আমাদের সাধারণ সকলের হৃদয়ে তবেই বুঝি তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসে মানবদরদী যে মানুষটি বাংলা ও বাঙালির জীবনে যে যুগান্তর এনেছেন এই সম্মান তো তাঁর মতো মানুষেরই প্রাপ্য। সবশেষে নিজের অকপট স্বীকারোক্তিঃ আমার স্বল্প জ্ঞান, যোগাযোগের অভাবে এই ক্ষুদ্র পরিসরে অধরা রয়ে গেল অনেক তথ্য অনেক গুণীজনের নাম।

ঋণস্বীকারঃ

লাল্টলুয়াংলিয়ানা খিয়াংটে/অধ্যক্ষ/ শ্রীরামপুর কলেজ

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/ কিউরেট/ কেরী লাইব্রেরি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার

শৌভিক দাশগুপ্ত/ অধ্যাপক/ শ্রীরামপুর কলেজ

‘কথোপকথন’/ করুণা পাবলিকেশনস্‌

গ্রন্থ সমালোচনা

‘চেনা অচেনা পথ চলায়’: ভাবনা ও নতুন চেতনার সমন্বয়

শ্রীতম মজুমদার

‘কোনটা পত্রিকায় ছাপা, কোনটা বা পড়ার ঘরের হিজিবিজির ফাইলপত্রে মুখ লুকোনো অবস্থা থেকে তুলে আনা’- সংকলনে ঠাঁই পাওয়া লেখাগুলি সম্পর্কে একথাই বলতে হয়। প্রবন্ধগুলি একদিকে যেমন মৌলিক আবেদন রাখে অন্যদিকে পাঠক প্রবন্ধগুলি পাঠ করে এক অনাবিল আনন্দ লাভ করে। এ তো গেল লেখার কথা। এবার লেখকের কথা। তিনি এবারে নতুন উদ্যমে, নতুন পরিচয়ে। সাহিত্যের সাথে বসত তার অনেকদিনের; তবে পরিচয়টা আজ অন্য। প্রাবন্ধিকরূপে। তিনি প্রাবন্ধিক সুমিতা চট্টোপাধ্যায়। লেখকের হৃদমাঝারে সাহিত্যের নানান ভাবনাচিন্তা এসেছে উজাড় করে। প্রাবন্ধিকের মনে উঁকিঝুঁকি মারা সেইসব ভাবনা চিন্তামূলক বিষয়গুলোকে নিয়ে বের হল আনকোরা এক প্রবন্ধ সংকলন ‘চেনা অচেনা পথ চলায়’।

ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক, সাধারণ পাঠক থেকে মননশীল পাঠক যারা রোজকার একঘেয়ে বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেন, সাহিত্যের আলোচনায় যে সব পাঠকরা প্রীত হন, এই বইটি পড়ে তারা অবশ্য বাংলা সাহিত্যের এক ঝটিকা সফর সেরে নিতেই পারেন। প্রাবন্ধিক তার প্রবন্ধগুলি নিয়ে কোনোরকম তাড়াহুড়ো করেন নি। লিখেছেন বেশ রয়ে সয়ে। যে কারণে অনেক সময় ব্যয় হলেও প্রবন্ধগুলি কিন্তু যথেষ্ট উপভোগ্য।

বইটির বিষয়সূচি তিনটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম পর্বের ভিত্তি ‘প্রাক-আধুনিক পর্ব’। দ্বিতীয় পর্বের নাম ‘আধুনিকতার উন্মেষ’। এই পর্বে প্রাবন্ধিক দুটি উপপর্ব রেখেছেন। এক। ‘রবীন্দ্রনাথ’, ও দুই ‘বিবেকানন্দ’। এবং অন্তিম পর্ব ‘আধুনিক যুগ’। বইটির প্রতি পর্বে ও উপপর্বে রয়েছে ৩টি করে গবেষণামূলক প্রবন্ধ। সর্বমোট ১২টি প্রবন্ধ ঠাইঁ পেয়েছে এই বইতে।

ভবিষ্যতের দরজায় কড়া-নাড়ার কৌতূহল যেমন কৌতূহলী মানুষের চিরকালের প্রবণতা; তেমনই অতীতের অন্ধকারে সার্চলাইট জ্বেলে ধুলোয় চাপা পড়ে থাকা নিঃসাড় অস্তিত্বকে জানার আকাঙ্ক্ষাও সচেতন পাঠকের চিরদিনের নেশা। অতীতের বহু ঘটনাই আমাদের কাছে রূপকথার মতো। সেই যুগে সৃষ্ট রামায়ণ রূপকথার চেয়ে কোন অংশে কম নয় এবং অবশ্যই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। রামকথা নিয়েই রামায়ণ লেখা। কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস দুজনেই রামকথার জনপ্রিয় কথক। দুই সময়ের কবি তাঁরা। দুই প্রান্তেরও। একজন পূর্ব ভারতের তো অপরজন উত্তর ভারতের। অবস্থানের সঙ্গে লেখার ধরণটাও তাদের ভিন্ন। এ হেন কবিদের কলমে উঠে এসেছে রামকথা। উঠে এসেছে নিজ নিজ সময়ের সমাজবাস্তবতার টুকরো টুকরো ছবিকথা। আর সেই বহমান ছবিগুলোকে এক ফ্রেমে বন্দি করে প্রাবন্ধিক সমকালের সমাজ সংস্কার ও মানুষজনের মানসিকতাকে দুই কাব্যের প্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

চৈতন্যদেব বাংলার প্রাণপুরুষ তথা বাংলা সাহিত্যের এক কৃতীপুরুষ এবং অবশ্যই কিংবদন্তী। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছিলেন। ঘুরেছিলেন পদব্রজে। তাঁর পদব্রজের রেখাচিত্রে শিবমাহাত্ম্যের পুণ্যভূমি ‘কাশী’ নামের স্থানটিও এসে পড়ে। প্রাবন্ধিকের ক্ষেত্র যেহেতু কাশী তাই তিনি তার প্রবন্ধ সূচিতে মহাপ্রভুর প্রকৃত বৈরাগ্য, সন্ন্যাসী মানুষের জীবনচর্যা, মহাপ্রভুর কাশীতে আগমন ও কৃষ্ণনাম প্রচারের ঘটনাটিকে আপন হৃদয়ের কোমল অনুভূতি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

সুখের পাশেই বসত করে দুঃখ। একে অপরের বিপরীত হলেও পাশাপাশি সহবস্থানে তারা সহোদর। বর্তমান সময়ে শুধু নয়, আশা-নিরাশা, মানবজীবনের আলেখ্য সুনিপুণভাবে ধরা পড়েছে আঠারো শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের পাতাতেও। সমকালীন লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির দিকটি প্রাবন্ধিক অভিনব প্রয়াসের সঙ্গে দেখিয়েছেন। কাহিনি কথার সঙ্গে বর্ণিত বিবাহ প্রসঙ্গ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সমাজে নারীর অবস্থান, নারীর অলংকার প্রেম, যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য তালিকা, সমাজের ঘেরাটোপ, লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদ –প্রবচন প্রভৃতি দিকগুলিকে প্রাবন্ধিক উজ্জ্বলকিরণে উদ্ভাসিত করেছেন। প্রাক-আধুনিক পর্বের প্রবন্ধগুলি আলোচনার পর এবার আলোকপাত করতে হয় দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ আধুনিকতার উন্মেষ পর্বে।

রবিঠাকুরের প্রতি দুর্বলতা সব পাঠকের আছে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা আছে, শ্রদ্ধা আছে। প্রাবন্ধিক সুমিতা চট্টোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখেছেন তিনি তিনটি আলোচনা মূলক প্রবন্ধ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের আবেগ; মানুষ রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম, কবি রবীন্দ্রনাথকে কতটা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেই আলোচনাই এখানে প্রধান উপজীব্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের টালমাটাল পরিস্থিতিতে লেখা রবীন্দ্র উপন্যাস ‘ঘরে-বাইরে’। উপন্যাসে এসেছে স্বামী-স্ত্রীর এক অসুখী দাম্পত্যের টানাপোড়েন এবং ঘটনায় টুইস্ট আনার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির অযাচিত প্রবেশ। স্বামী নিখিলেশের থেকে উপেক্ষিতা নারী বিমলা সহজেই অন্যপুরুষ সন্দীপের প্রতি ভয়ঙ্কর ভাবে আকর্ষিত হয়েছে। দুর্বার গতিতে সে মেতেছে পরকীয়ায়। প্রবন্ধিক বিমলাকে আত্মসমীক্ষণের চেয়ারে বসিয়ে তার থেকে স্মৃতিকথা শুনেছেন ও পাঠককে শুনিয়েছেন। ‘ছেলেবেলা’ রবীন্দ্রনাথের শুধুমাত্র এক গ্রন্থখণ্ড নয়, তা রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোরের নির্ভেজাল স্মৃতিকথাও। রবিকলমের ঘটনাগুলি এই প্রবন্ধে এসেছে এক তরঙ্গ নিয়ে। তরঙ্গ কবির সরল গদ্যে, কথালেখার ভাষায়, কবির চিত্রময়তায়, অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েদের অবস্থায়, লৌকিক কাণ্ড কারখানায়, কৌতুকের রসনায়। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ ছেলেবেলার স্মৃতির পাতায় আরও একবার প্রাবন্ধিক পাঠক সকলকে নিয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখাগুলি রেখাঙ্কনে প্রাবন্ধিক আখ্যানের পর আখ্যান রচনা করে গেছেন।

দ্বিতীয় উপপর্ব ‘বিবেকানন্দ’। সুমিতা চট্টোপাধ্যায় পরিচয়ে একজন বিবেকানন্দ গবেষক। তাকে বিবেকসাহিত্যের স্পেশালিষ্ট বলা চলে। এই পর্বটিতে তার যে বিশেষ সহানুভূতি থাকবে তা পাঠক মাত্রেই জানবেন। শুধু সহানুভূতি নয়, গবেষণার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এই পর্বের তিনটি প্রবন্ধকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। বিবেক সাহিত্যের প্রবন্ধগুলি উপাদানের প্রাচুর্যে ভরপুর। বিবেকানন্দের গদ্যে; বিবেকানন্দের গল্পে এসেছে ‘লোকশিক্ষা’র প্রসঙ্গ। ‘স্বামীজির ধর্মভাবনা’ সে তো উন্নত ভারত নির্মাণেরই প্রথম প্রয়াস এবং নারীকে স্বমহিমায় নিজ ব্যক্তিত্বে আসীন হতে বিবেক মানসই তো প্রথম এগিয়ে আসেন। আসলে, নারী নারীর মতোই পবিত্র। দিন যত এগোবে নারী তত নিজ বলে এগোবে। কেবলমাত্র পবিত্রতার কারণেই সে পিছু হটবে না। প্রাবন্ধিক নিজে নারী, তাই নারীত্বের স্বরূপ তিনি এখানে যথাযথ ভাবেই উন্মোচন করেছেন। বিবেক প্রবন্ধ পাঠের পর পাঠকের এক পরিশীলিত মন প্রস্তুত হয়ে যায়। ফলে পাঠক মনের উদারতায় বিবেকসমুদ্রে স্নান করেন। অপার স্নিগ্ধতায় স্নিগ্ধা হন।

আধুনিক যুগে এসেই মন প্রশ্ন করে ‘জীবন কী’? উত্তরটা মনই আবার দিয়ে দেয়- অন্তবিহীন পথে চলায় জীবন। মনের এই সহজ অভিব্যক্তিকে বিভুতিভূষণের পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের সাথে তুলনা করলে ভুল হবে না। পাঁচালী যে ঢঙে পরিবেশিত হয়, যে ছন্দে তা বয়ে চলে, মানুষের জীবন কী কোন অংশেই তার চেয়ে কম যায়! জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে সুরে যে আমরা সবাই বাঁধা। কীর্তিমান মানুষেরা তাঁদের কীর্তিতে বেঁচে থাকেন আর অপুর মতো সাধারণ মানুষেরা ফেলে আসা জীবনের পাতাগুলো উলটিয়ে-পালটিয়ে দেখতে থাকে। অতীতস্মৃতিকে নিবিড় অনুভূতি দিয়ে বুকে জড়িয়ে নিজের কল্পনায় বুঁদ হয়ে থাকে। ‘পথের পাঁচালীতে বেজে উঠেছে এক অন্তহীন পথের গান। সে গান জীবনের গান। সেই গানকে অনুভব করে, গানের অনুভূতিকে সুরবন্দী করে প্রাবন্ধিক পাঠককে সিমফনির ধ্বনি মায়াময় পরিবেশে নিয়ে যান।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী সেই তরল পদার্থ, যাকে যে পাত্রে রাখা হয় সে সেইমতোই আকারপ্রাপ্ত হয়। আসলে সে বাধ্য হয়। তাকে বাধ্য করা হয়। নারী যাতনার আওয়াজ ‘শুনব না’ ভান করা মানুষের কানে আসে না। যদিও এ গল্প অনেক আগের। তবে এখনকার গল্পটা অনেক পরিবর্তিত। প্রাবন্ধিক ধরলেন নারী স্বাতন্ত্র্যের লেখনীকার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলমকে। সেকালের মেয়ের থেকে একালের মেয়ে অনেক আগুনে। তাদের অধিকারের দাবিতে তারা লড়াকু। আলোচনার সুবিধার্থে সুমিতা চট্টোপাধ্যায় নিপুণ কুশলতার সাথে কবির কবিতার লাইনগুলো ব্যবহার করেছেন- ‘পরনে ছিল না চেলি/ গলায় দোলেনি হার;/ মাটিতে রঙিন আশা/ পেতেছিল সংসার’। নারীর বিদ্রোহিনী রূপ- ‘মুষ্টিবদ্ধ একটি শানিত হাত/ আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত;’। প্রাবন্ধিক এখানে নারীমনের কথাগুলোকে তাদের ঠোঁট থেকে এনে বর্তমানের নারীকে জাগিয়ে তুলেছেন।

‘সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে’-এ এক গভীর প্রশ্ন। লোকের কৌতূহল লালনের জাত নিয়ে কিন্তু জাতের উপরেও যে সে ‘এক মানুষ’- এ উপলব্ধি তাদের আসে না। সিরাজের ছোটগল্পকে অবলম্বন করে প্রাবন্ধিক সেই মানব উপলব্ধির উন্মোচনকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষ কখনোও একরূপে চলতে পারে না। স্থান-কাল-পাত্রে তাকে নিরন্তর অভিনয় করতে হয়। সিরাজের গল্পে এসেছে মানবমনের প্রবৃত্তি, মানুষের প্রতিশোধ স্পৃহা, লোভের নোলা, যৌনকামনা, প্রেম-মমতা, মানবিক সংকলন, ব্যক্তি স্বাধীনতা। সিরাজের কথায়-‘এই জীবকে আমি দেখেছি, ভালোবেসেছি, তাদের কথাই লিখতে চেয়েছি’। রঙ্গমঞ্চে মানুষ মুখে রঙ মাখে। জীবনের রঙ্গমঞ্চে মানুষ কিন্তু রঙ মাখার সময়টুকুও পায় না। কারণ খিদে পেটে সে খাবার খুঁজতে ব্যস্ত থাকে। এটাই তো জীবন। সেই জীবনের ছায়া পড়েছে সিরাজের গল্পে। সংকলনের শেষ প্রবন্ধে।

এই প্রবন্ধ সংকলনটি বাংলা সাহিত্যের সম্ভারে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। প্রচ্ছদটি বেশ নজর কেড়েছে। বইয়ের মলাট, ছাপার হরফ ও পাতার মানের প্রতি প্রকাশনা সংস্থা ‘এবং প্রান্তিক’ অনেক যত্নবান। তবে প্রুফ সংশোধনে আর একটু দায়িত্ববান হওয়ার প্রয়োজন ছিল। হলে কি হত, অনেক জায়গায় ছাপাজনিত ত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ থাকত। একাকী নিভৃতে সুমিতা চট্টোপাধ্যায় লিখে গেছেন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেন্দ্রিক প্রবন্ধ। প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন প্রকৃত মানুষকে, মানুষের সুস্থ জীবনকে, মানুষের মনুধর্মকে।

বই –চেনা অচেনা পথ চলায়

লেখক –সুমিতা চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক- এবং প্রান্তিক

মূল্য- ৮০ টাকা

**রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতিচেতনা**

**দোলন মুখার্জী**

বাংলা সাহিত্যের গুলবাগিচায় সুগন্ধি পুস্পরূপে প্রস্ফুটিত একাধিক সাহিত্যিক তাঁদের লেখনী-সৌরভে পাঠককে ভাববিহ্বল করে তুলেছেন; তাঁদের মধ্যে একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ নাম রবীন্দ্রনাথ। যাঁর মধুর আলোর স্পর্শে সাহিত্যের প্রতিটি প্রাঙ্গন হয়েছে শস্যশ্যমলা, সবুজ। তাই তো তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীর স্বরূপ; রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতির রাজ্যের এক অনুপম সন্তান রবীন্দ্রনাথ। তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন খুব নিবিড়ভাবে, নিজের করে। যার জন্য তিনি বারবার ছুটে গেছেন পদ্মা কিম্বা পল্লীপ্রকৃতির কোলের কাছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। যদিও বা কিছু বলা হয়ে ওঠে তবুও মনে হয় – “শেষ হয়েও হইল না শেষ”। তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলিকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছেন। তাই তিনি বলেছেন “.........আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি। যা-কিছু শিখেছি নিজে দেখেছি; মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। .........আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি; বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে” (“গান ও ছবি”/ সাহিত্য)। সেইজন্যই হয়তো বা প্রকৃতি, পল্লীর ছবি, বর্ষা কিম্বা নদীর চিত্রগল্প বারবার ফুটে উঠেছে নানা ছোটগল্পে। পল্লীমায়ের খুব কাছের সন্তান বলেই হয়তো এই উপলব্ধি তাঁর মধ্যে গাঁথা পড়েছিল। যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ফুলে-ফলে বিকশিত হতে থাকে এবং শেষ বয়েসে একসুত্রে গাঁথা মালার মতো আমরা পেয়ে যায় রবীন্দ্র সাহিত্যের নানাদিক।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ‘বর্ষাযাপন’ কবিতায় বলেছেন -

“ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা

নিতান্তই সহজ সরল

সহস্র বিস্তৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি

তারি দু-চারটি অশ্রুজল।

নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,

নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে

শেষ হয়েও হইল না শেষ”

(‘বর্ষাযাপন’/ সোনারতরী)

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে গীতিধর্মীতার নানা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। যদিও রবীন্দ্রনাথ তা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন “আমি একটা কথা বুঝতে পারি নে, আমার গল্পগুলিকে কেন গীতিধর্মী বলা হয়। এগুলি নেহাত বাস্তব জিনিস। যা দেখেছি, তাই বলেছি। ভেবে ও কল্পনা করে আর কিছু বলা যেত; কিন্তু তা তো করি নি আমি” (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ)। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু মূলত কবি, তাই তার রচনায় যে কবির খেয়াল রসের বা কাব্যের আমেজ কিছুটা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে অজ্ঞাতসারেই। যেটা শেক্সপীয়রের সাহিত্যের দিকটি বিচার করলেও একই বিষয় সহজেই চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সীমিত পরিসরে মধ্যে প্রকৃতিকে খুবই সুন্দরভাবে স্থান দিয়েছেন। কখনো মনে হয় প্রকৃতিই হয়তো তাঁর ছোটগল্পের মূল চরিত্র রূপে সমগ্র কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। প্রকৃতির নানান অপূর্ব চিত্রগল্প তাঁর সমস্ত ছোটগল্পকে করে তুলেছে এক অনন্য সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন। নিসর্গ প্রকৃতির ছায়া রবীন্দ্র ছোটগল্পে অনিবার্য অবস্থান। তা না হলে হয়তো রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পূর্ণ হতো না। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন – “মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোঘল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে”।

রবীদ্রনাথ জমিদারি দেখাশোনার কারণে বিভিন্ন স্থানে যেতেন। যার প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে ছাপ পড়েছে তাঁর রচনায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন –“গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম গ্রামান্তরের পথে ফেরা এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়”। কিম্বা “পল্লীর দুঃখ দৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, তার জন্য কিছু করবো এই আকাঙ্খায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল”। তাছাড়া “বাঙলা দেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি; এর নতুনত্ব চলন্ত বৈচিত্রের নতুনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয় অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। .........ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহল আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, সে উদ্ধোধন এসেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটোগল্পের নিরন্তর ধারায়”। এ সমস্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার সুবাদেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ পল্লীপ্রকৃতি কিম্বা সাধারণ মানুষকে লেখনীর কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছেন। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ – ‘ছুটি’, ‘সুভা’, ‘একরাত্রি’, ‘পোস্টমাস্টার’, ‘সমাপ্তি’ প্রভৃতি গল্প।

রবীন্দ্রনাথের তিনখন্ডে লেখা গল্পগুচ্ছে সর্বমোট গল্পের সংখ্যা ৮৪টি। প্রথম গল্প ‘ঘাটের কথা’(১৮৯১ কার্তিক; ভারতী), যদিও তার পূর্বেই ‘ভিখারিণী’ (১২৮৯ ভাদ্র; ভারতী) গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। এটিকে সূচনা অংশ বলা গেলেও সার্থক প্রয়াস কখনোই না। সর্বশেষ লেখা ছোটগল্প ‘প্রগতি সংহার’; এবং সর্বশেষ প্রকাশিত ছোটগল্প ‘বদনাম’ (১৩৪৮ আষাঢ়, প্রবাসী)। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিকে ‘রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ’ গ্রন্থে প্রধাণত সাতটি ভাগে বিভক্ত করেছে অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ। সেগুলি হল - ১) সূচনা পর্ব ২) হিতবাদী পর্ব ৩) সাধনা-ভারতী পর্ব ৪) সন্ধি পর্ব ৫) সবুজপত্র পর্ব ৬) লিপিকা পর্ব ৭) অন্ত্য পর্ব।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য খুবই বেশী। তবুও মোটামুটিভাবে এগুলিকে নিন্মলিখিত শ্রেণীবিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন –

১) সমাজ সমস্যামূলক গল্প–‘দেনা-পাওনা’, ‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’, ‘অনধিকার প্রবেশ’, ‘সমস্যাপূরণ’, ‘মানভঞ্জন’, ‘ত্যাগ’, ‘বিচারক’, ‘নষ্টনীড়’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘হৈমন্তী’, ‘ভাইফোঁটা’, ‘নামাঞ্জুর গল্প’, ‘পাত্র ও পাত্রী’, ‘পয়লা নম্বর’ প্রভৃতি।

২) পারিবারিক সম্পর্কমূলক গল্প –‘কাবুলিওয়ালা’, ‘ঠাকুরদা’, ‘শাস্তি’, ‘দর্পহরণ’, ‘ব্যবধান’, ‘মধ্যবর্তনী’, ‘দান-প্রতিদান’, ‘খাতা’, ‘রাসমণির ছেলে’, ‘দিদি’, ‘হালদার গোষ্ঠী’ প্রভৃতি।

৩) জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কিত গল্প – ‘অতিথি’, ‘একরাত্রি’, ‘পোস্টমাস্টার’, ‘সুভা’, ‘সমাপ্তি’, ‘ছুটি’ প্রভৃতি।

৪) রোমান্স ও অতিপ্রাকৃত গল্প – ‘দুরাশা’, ‘মণিহারা’, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, ‘দালিয়া’, ‘জয়-পরাজয়’, ‘মহামায়া’ প্রভৃতি।

৫) রাজনৈতিক চেতনাযুক্ত গল্প – ‘রাজটীকা’, ‘দুর্বুদ্ধি’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’ প্রভৃতি।

৬) বিবিধ-জাতীয় গল্প –‘কঙ্কাল’, ‘গুপ্তধন’, ‘ডিটেকটিভ’, ‘প্রায়শ্চিত্ত’, ‘নিশীথে’, ‘গিন্নি’ প্রভৃতি।

আমার বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কিত গল্পগুলিকে নিয়েই। আমি এর মধ্যে থেকে ‘একরাত্রি’, ‘পোস্টমাস্টার’ ও ‘সমাপ্তি’ গল্পগুলিকে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘একরাত্রি’ গল্পটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়। গল্পটি সম্পূর্ণ উত্তম পুরুষে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতি রাণীর ঐশ্বর্যরূপ খুলে যায় বর্ষায়। বর্ষাকে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন তাঁর রচিত গল্পের মধ্যে। বর্ষা গল্পের পটভূমি থেকে উঠে এসে চরিত্রের মনোভূমি অধিকার করে নেয়। প্রকৃতিই যেন ‘একরাত্রি’ গল্পের মূল চরিত্র। যা সমস্ত চরিত্রকে ছাপিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজ মহিমা। যেমন – “স্কুল ঘরটি লোকালয় হইতে কিছুদূরে একটি বড়ো পুষ্করিণীর ধারে। চারিদিকে সুপারি নারিকেল এবং মাদারের গাছ, এবং স্কুল গৃহের প্রায় গায়েই দুটা প্রকান্ড নিম গাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে”। কিম্বা – “দুপুরবেলায় ক্লাসে যখন ছাত্রেরা গুন্‌গুন্‌ করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত ঝাঁ ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিম গাছের পুস্পমঞ্জুরির সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত”। বর্ষা এই গল্পে রুদ্রমূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। তবে সংহারের জন্য নয়; মিলনের জন্য। সোমবার প্রাকৃতিক দূর্যোগের মধ্যে দিয়ে এই গল্পটি শুরু হয়েছে। দুই প্রেমিক হৃদয়ের মিলন ঘটাতে বর্ষার আর্বিভাব। যা গল্পকথকের কাছে একদিন সহজলভ্য ছিল তা আজ দুস্প্রাপ্য। গল্পের নায়ক সুরবালার মিলন-সুখ লাভ করে বর্ষার এক প্রলয়রাতে। বর্ষার রুদ্র প্রলয়ের ডমরুধ্বনিতে মানুষের মিলনাভূতি উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠে। এই প্রলয়কালে আকাশ ছিল তারাশূন্য এবং পৃথিবীর সমস্ত আলো নিবে গেছে। গল্পের নায়ক ও সুরবালা জলমগ্ন পৃথিবীবৃত একটি দ্বীপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এইসময় নায়কের মিলনাভূতি এইরকম – “আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশব সুরবালা কোন্‌ এক জন্মান্তর কোন এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া, এই সূর্য-চন্দ্রালোকিত লোক পরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।...আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি। ...আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা”।

‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটি ১২৯৮ সালে লেখা। বর্ষাকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি একই বিষয়কে একাধিক গল্পে ব্যবহার করেছেন। বর্ষাকে রবীন্দ্রনাথ স্বজন বিচ্ছেদের রূপকল্প হিসাবে ব্যবহার করেছেন। পল্লীপ্রকৃতির গ্রাম্য পরিবেশে শহরনিবাসী পোস্টমাস্টার নিঃসঙ্গ বোধ করে। বর্ষা প্রকৃতি তাঁর হৃদয়ের ব্যকুলতা পাখীর গানে বহন করে আনে। আপনজনের স্নেহের পরশের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রতন যেন সেই মানবতার পূর্ণ রূপ। আর বর্ষা যেন তাঁর আলম্বন বিভাব। যেমন – “একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরকারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না – সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কন তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবিশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল”। কিম্বা – “যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন – একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যাথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ‘ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আনি – কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বাহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে – এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী? পৃথিবীতে কে কাহার?”

রবীন্দ্রনাথ ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রতন সম্পর্কে বলেছেন - “সমাজ ও পরিবারের আবেষ্ঠনীর বাইরে এক নগন্য অশিক্ষিত পল্লীবালিকার কোমল হৃদয়ের অতিক্ষুদ্র ইতিহাসের কয়েকটি রেখাঙ্কন নিত্যকালের বৃহৎ মানব-ইতিহাসের দিগন্তে অভিনব উজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠেছে। ......পিতৃমাতৃহীন, স্নেহের কাঙাল; এক দরিদ্র পল্লী-কিশোরীর হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন বিচ্যুত হওয়ায় তার জীবনে যে নিদারুণ বেদনা ও করুণ অসহায়তার সৃষ্টি হয়েছে, সেই প্রতিকারহীন, অন্তগূঢ়, মূকবেদনা সমস্ত গল্পটাকে আচ্ছন্ন করে এর মধ্যে একটা কোমল, অশ্রুবাস্পাকূল কারুণ্যের অপূর্ব ছায়াবীথি রচনা করেছে। পাঠকের মন এই বেদনার ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে এবং ক্ষুদ্ধ গ্রাম্যবালিকা রতনের বেদনা মানবহৃদয়ের একটা চিরন্তন বেদনার সঙ্গে মিশে যায়”।

প্রকৃতি বিচিত্ররূপিনী। আর বিচিত্ররূপিনী বলেই চিরন্তনী। সে কখনোও বা সুখের কখনোও দুঃখের বার্তাবহ। ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে প্রকৃতি দুঃখের বার্তা নিয়ে এসেছে। বর্ষাকালের প্রবল বর্ষার মধ্যে প্রিয়জনের জন্য মন বারবার ব্যাকুল হয়েছে। সদ্য বৃষ্টিতে ভেজা গাছের পাতা ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখে শহর খেকে আগত পোস্টমাস্টারের ‘আপনার লোক’ ও ‘স্নেহময়ী নারী ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে”। রতন তো প্রকৃতিরই মূর্ত প্রতীক। তাঁর ভালোবাসা অকৃত্তিম ও গভীর। তাই – “সে সেই পোস্টঅফিসের গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে – সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না”। কিন্তু “হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে”। আসা এবং যাওয়া প্রকৃতির ধর্ম। কোনো কিছুই চিরকালের নয়, কোনো বন্ধনই তাকে ধরে রাখতে পারে না। “যেতে নাহি দেব” বলার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে কিন্তু ‘তবু যেতে দিতে হয়’।

‘সমাপ্তি’ গল্পটি ১৩০০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় ‘সাধনা’ পত্রিকায় হয়। গল্পটি শুরু হয়েছে বর্ষাকাল ও নদীকে কেন্দ্র করে। নদীটির আয়তনে ক্ষুদ্র, যা গ্রীষ্মকালে একেবারে শুকিয়ে যায় ও বর্ষায় দুকূল ছাপিয়ে যায়। রবীদ্রনাথ গল্পের নায়ক যুবক অপূর্বকৃষ্ণের ভেতরের ছবি প্রসঙ্গে বর্ষার প্রসঙ্গকে এনেছেন। যার “মানসনদী নববর্ষার কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জ্বলজ্বল এবং বাতাসে ছলছল করিয়া উঠিতেছে”। কিন্তু অপূর্বের অসহায় পতন “এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠের তরল হাস্যলহরী”- চারিদিক আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। সমস্তই ঠিকই ছিল কিন্তু এই অকস্মাৎ পতন অপূর্বকে অত্যন্ত লজ্জার মধ্যে ফেলেছিল। সকালের স্নিগ্ধ কোমল সূর্যের আলো, ভরা বর্ষার নদীর তীর, ছায়া নিবিড় গহীনবন ও পাখির মিষ্টি কূজনের থেকেও অপূর্বের মনে দোলা দিয়েছে – “একটি উচ্ছ্বসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি”। হয়তো বা সেই কারণেই তাঁর নব্য শিক্ষিত মন কখোনই জড়োসড়ো মার্কা কনেকে পচ্ছন্দ না করে; পছন্দ করেছে এই উচ্চহাস্যময়ী, উৎশৃঙ্খল, দুরন্ত, পাগলী মৃণ্ময়ীকে। সে প্রকৃতির সন্তান ছিল বলেই তাঁর বাধা ভাবলেশহীন মনোভাব তাকে আরো সুন্দর করেছে। তাই অপূর্বের বারবার সেই সরল মুখ মনে পড়েছে। কারণ – “পৃথিবীর অনেক মুখ চোখে পড়ে, কিন্তু এক-একটি মুখ বলা কহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উর্ত্তীণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, আর একটা কী গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা”। তাই বলাই যায় –

“প্রেম করো মন প্রেমের মর্ম জেনে।

প্রেম করা কি কথার কথা রে

গুরু লহ চিনে।

চণ্ডীদাস আর রজকিনী

তারাই প্রেমের শিরোমণি

এক মরণে দুজন মলো রে

প্রেম পূর্ণ প্রাণে”।

(‘প্রেম ও বন্ধুতা’, ‘শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ’, অন্নদাশঙ্কর রায়, পৃঃ ১৪১)

তারপর অপূর্ব মৃণ্ময়ীকে বিয়ে করে। যা প্রতিবেশীদের কাছে ‘অপূর্ব-পছন্দ’। কিন্তু তাঁর বন্য প্রকৃতির অবাধ্য মনকে সংযত করা সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই সে শ্বশুরঘর থেকে পালিয়ে রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে কখনোবা বাবার কাছে যাবার জন্য তাঁর মন বিদ্রোহ করে উঠেছে। পরিশেষে পালিয়েও গেছে, কারণ তাঁর বন্যমন কিছুতেই অপূর্বের মায়ের শাসনের খাঁচার মধ্যে থাকতে চায়ছিল না। অপূর্বও তাঁকে কিছুটা বুঝেছিল বলেই রাখাল বা বাবার কাছে নিয়ে যাওয়া ঠিক করেছিল। এরপর আইন পড়ার জন্য অপূর্ব কলকাতা চলে যায়। কিন্তু মৃণ্ময়ীকে রেখে যায় বাপের বাড়িতে। কিন্তু সমস্তই যেন তাঁর ফাঁকা ফাঁকা লাগে, কিছুই ভালো লাগে না। মৃণ্ময়ীর জীবনের এক বৃহৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। সে বাল্য ছেড়ে যৌবনের দুয়ারে চলে এল। তখন – “একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমনী প্রকৃতি মৃণ্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল” এবং সে প্রবল ভালবাসার সঙ্গে অপূর্বকে বাড়ি ফিরে আসতে বলে প্রেমের পত্র লিখলেও তা ছিল ঠিকানা বিহীন। ফলতঃ সে প্রয়াস হল অনর্থক।

অপূর্ব ছুটিতে বাড়ি না আসায় মৃণ্ময়ীকে নিয়ে অপূর্বের মা কলকাতায় গেলেন ছেলেকে দেখতে। সেই রাত্রি ছিল বর্ষামুখর। ফলতঃ অপূর্বের মনে অপূর্বকে দেখার জন্য মন ছটফট করতে লাগল। সে ভাবতে লাগল মৃণ্ময়ী কি আসতে পারত না? মনে মনে অভিমান হলেও সে সমস্তই চেপে রাখল। প্রবল বর্ষার মেঘের মতো তাঁর মন বারবার হাহাকার করে উঠেছিল। তারপর বিছানায় শুতে গেলে – “হঠাৎ বলয়নিক্কনশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুস্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তাহার পর বুঝিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায় অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজল ধারায় সমাপ্ত হইল”। তাই বলতেই পারি –

“কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া

এসেছি ভুলে।

তবু একবার চাও মুখপানে

নয়নতুলে।

দেখি, ও নয়ন নিমিষের তরে

সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,

সজল আবেগে আঁখি পাতা দুটি

পড়ে কি ঢুলে।

ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙয়ো না,

এসেছি ভুলে”।

(‘ভুলে’, ‘মানসী’, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২৩)

পরিশেষে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ তার ছোটগল্পে প্রকৃতিকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। যা কখনো মূল ঘটনা বা মূল চরিত্রের সঙ্গে হয়ে গেছে একাত্ম। প্রকৃতির সঙ্গে গভীর ভালোবাসার জন্যই তিনি এমন সব গল্প লিখতে পেরেছিলেন। এ কথা তিনিও স্বীকার করেছেন যে এগুলি বাস্তবিক। তিনি প্রকৃতি বা চরিত্রকে যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। তাই আমরাও বলতেই পারি এগুলি অনুভূতির, আবেগের ও মননের। যা একান্তই নিজস্ব ও প্রকৃতই সহজাত।

গ্রন্থঋণ -

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : গল্পগুচ্ছ ,বৈশাখ ১৪০৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

২) বিশী, প্রমথনাথ : শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১, মিত্র-ঘোষ, কলকাতা।

৩) দাশগুপ্ত, সুরজিৎ : বাংলা ছোটগল্পের সূচনা ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, জানুয়ারি ২০০৬, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৪) ঘোষ, তপোব্রত : রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ, আগস্ট ২০০৩, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৫) সিংহ, মীনাক্ষী : গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র, ২২ শে শ্রাবণ, ১৪১১, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৬) বিশী, প্রমথনাথ : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, বৈশাখ ১৩৭৫, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

দিগিন্দ্রচন্দ্রের’অপচয়’নাটকে দুঃখের মধ্যে বাঁচার আকুতি

আশিস রায়

সময়ের দুর্বিপাক কি না জানি না ।কপাল খারাপ কিনা সেটাও বলতে পারবো না ।নাকি অদেষ্ট ।এর কোনটির উত্তর আমাদের কারোর কাছে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না ।এসব পরিস্থিতি সমাজে আপন অবস্থায় তৈরি হয় বলে আমার মনে হয় না ।সবটাই সুযোগ বুঝে তৈরি করা হয় ।নিজেদের ধান্দায় ,নিজেদের স্বার্থে ।মেয়েরা তো কোনদিন অবলা ছিল না ।মানব জাতির প্রথম শিক্ষক নারীই ।সন্তানের জন্মের পর মুখের বোল ফোটানো থেকে শুরু করে সবটাই ।একটা সমাজ ব্যবস্থা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে নারীর ভূমিকাকে আমরা ছোট করে দেখি ।নারীদের কে পিছিয়ে রাখি নিজেদের কে বড়াই করে দেখানোর জন্য ।স্বামী তার স্ত্রীকে শুধুমাত্র নিজের শয্যা সঙ্গিনী ছাড়া আর কিছু কল্পনা করতে পারে না ।মল্লিকা সেনগুপ্তের একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে ।যেখানে তিনি দেখাচ্ছেন এক অত্যাচারী স্বামী আর অসহায় বউয়ের জীবনের অতিবাস্তব চিত্র –

মশারী গুঁজে দিয়ে যেই সে শোয় তার

স্বামীর কালো হাত হাতড়ে খুঁজে নিল

দেহের সাপব্যঙ, লাগছে ছাড় দেখি –

ক্রোধে সে কালো হাত মুচড়ে দিল বুক

বলল শোন শ্বেতা , ঢলানি করবে না

কখনো যদি ওই আকাশে ধ্রুবতারা

তোমাকে ঈশারায় ডাকছে দেখি আমি

ভীষণ গাড্ডায় তুমিও পড়ে যাবে,

শ্বেতার শ্বেত উরু শূন্যে দুলে ওঠে

আঁকড়ে ধরে পিঠ, স্বামীর কালো পিঠ ।

যখন পুরুষ নারীকে সম্পত্তি বানায়, অহেতুক সন্দেহ করে, নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌনতা আদায় করে, নিজের শ্রেষ্টত্ব বোঝানোর চেষ্টা করে, তখন সে এই ভাষাতেই কথা বলে ।এ প্রসঙ্গে কবি সুজয় সরকারের একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে –

এখনও পৃথিবীময় তৃণভোজী পঙ্গপাল

বিষাক্ত বাতাসে এখনও নির্বিষ ফলিডল

ধর্ষিতা ঘাসের উপর ছড়িয়ে আছে

চাপ চাপ রক্তের

চুপকথারা...

সচরাচর ছায়াদের কোন শরীর হয় না,

...আমাদের নির্বিবাদ ছায়াটও

আসলে একটা মানুষ খেকো !

ছায়ামানব !!

অসহায় সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আরো ভাববার বোধহয় দরকার আছে । কিছু মেয়ে যে লক্ষণরেখা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে , তছনছ করে দিতে চাইছে, এর ফলে বহু পুরুষ, বহু মগজ ধোলাই হওয়া নারী ক্ষেপে যাচ্ছেন ।তাদের মতে সমাজ ছারখার হয়ে যাচ্ছে, পশ্চিমী উচ্ছৃঙ্খলা ঢুকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের মহান ঐতিহ্য। জানি না কতটা সত্যি, কতটা মনগড়া বা কতটা নিজেদের ঢঙে বলে যাওয়া বুলি ।

নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্রের নাটকে নারীরা একটু অন্যরকম ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ।দিগিন্দ্রচন্দ্রের নারীরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে ।চেয়েছে পুরুষের তৈরি সংস্কারকে ভেঙে ফেলতে । শোষিত, বঞ্চিত নারীরা শুধুমাত্র মার খেয়েই দিন কাটাই নি । পালটা মার দেওয়ার জন্য প্রস্তুতও নিয়েছে ।পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তা চলেছে ।অনেক নাটকে দেখি পুরুষরা হার মেনে পিছু হটেছে সেখানে একজন নারী ঝাপিয়ে পড়ে সমস্যার মোকাবিলা করেছে । দিগিন্দ্রচন্দ্রের একাঙ্ক নাটক ‘অপচয়’ এ এমন এক নারীর পরিচয় পাওয়া যায় ।‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার পূজা সংখ্যায় ১৯৫৭ সালে দিগিন্দ্রচন্দ্রের প্রথম একাঙ্ক নাটক ‘অপচয়’ প্রকাশ পায়। নাটকটির কেন্দ্রমূলে আছে জাতীয় জীবনের এক চরম সমস্যা ।দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আসা একটি বিধবা পরিবারের বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যা এ নাটকের মূল বিষয়বস্তু । নাট্যকাহিনীর শুরুতেই দেখতে পাই একজন মধ্যবয়সী বিধবা মহিলা পাড়ার কৃশকায় যুবক মিলনের সঙ্গে চিন্তামগ্ন ভাবে বসে আছে ।দুজনের চিন্তার কারণ হল বিধবা মহিলা সুশীলার বড় মেয়ের আজ বিয়ে । কিন্তু বর এখনও আসেনি । যদিও বিয়ের লগ্নের আর বেশি বাকি নেই ।বরপক্ষ বরপণ হিসাবে ১০০ টাকা চেয়েছিল, সুশীলা ভিক্ষা করে সকলের কাছ থেকে জোগাড় করতে পেরেছিল মাত্র ৫০টি টাকা । সুশীলা বুঝতে পারে তাকে ঠকান হয়েছে ।আর এই ঠকানোর পিছনে আছে গ্রামের ছেলে ফটিকের হাত ।ফটিক সুশীলার বড় মেয়ে সন্ধ্যাকে চায় ।তবে ভালোবেসে সারাজীবন ঘর করতে সে চায় না ।চায় সন্ধ্যার শরীরটাকে শুধুমাত্র ভোগ করতে ।সন্ধ্যার শরীর ছাড়া আর কোনকিছুর মূল্য নেই ফটিকের কাছে । আর এ জন্যই কৌশল করে সন্ধ্যাদের সে ঠকাতে চাইছে। ফটিক সন্ধ্যাকে নানা রকম অশোভন ইঙ্গিত করেছে ।সন্ধ্যা প্রত্যেক বার সে প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হলে সুশীলা কারোর কাছে মুখ দেখাতে পারবে না ।কেননা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় লগ্নভ্রষ্টা মেয়েকে মূলত সমাজ বিতাড়িত করে রাখে। এই দুর্বিপাকে পড়ে সুশীলাকে বাধ্য হয়ে সন্ধ্যাকে ফটিকের হাতে তুলে দিতে হয়। ফটিককে গ্রামের লোক মূলত চোর বলেই জানে। সে পরের জিনিস চুরি করেই সুখে থাকতে চায়।চুরির টাকায় সুখের সংসার বসাতে চায়। সন্ধ্যা চোর ফটিককে ভালোবাসতে পারবে না ।সে ভালোবাসে মিলনকে।যে নিজে পরিশ্রম করে সংসার চালায়। ট্রেনে দু পয়সার লজেন্স বিক্রি করে মিলন। অভাব আর অনটনের সংসার হলেও সেখানে সুখ আছে ।আছে ভালোবাসা আর শান্তি ।মিলনও সন্ধ্যাকে ভালবাসে। তবে সে সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে ভয় পায়। তাই বিয়ে করতে রাজি নয় ।সে জানে অভাবের সংসারে আর একজনের খাবার জোগাড় করা তার পক্ষে খুব কঠিন।

মিলন উদার,পরোপকারী,তবে ভিন্ন জাতের। সমাজের বর্ণভেদ প্রথার দরুন মিলনের বর্ণটা অনেক নিচে। উপর জাতের মানুষেরা নিচের বর্ণের দিকে ভালোনজরে তাকায় না। সে জন্য ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে সুশীলা মিলনকে সহ্য করতে পারে না।তাই দিন আনা দিন খাওয়া এক বিধবা মহিলা সমাজের কাছে আতঙ্কিত হয়ে নিজের মেয়ে সন্ধ্যাকে তিরষ্কার করতে থাকে-

সুশীলা।। তা বইল্যা একটি ভিন্ন জাতের পোলার লগে কুলে কালি

দিলি তুই।

সন্ধ্যা।। দ্যাশ বাঙলো,বাড়ী বাঙলো,কপাল বাঙলো-তবে আমাগো

কুল বাঙলো না, মা ।তোমারে তো জাইতকুল দেইখাই

বিয়া দিছিল-জীবনে সুখ পাইছো কোনদিন?

সুশীলা।। (গালে চড় মেরে) এতবড় বেহায়া অইছস তুই। তর মুখে

এই সমস্ত কতা।

সন্ধ্যা ।। (জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে) তোমাগো পরিবর্তনের

বয়স নাই, মা। কিন্তু আমাগো আছে জীবনটাকে একবার

যাচাই কইরা-দ্যাখইতে চাই বাচনের নতুন পথ আছে

কিনা।

আর দশটা নারীর মত সন্ধ্যা নিজের কপালকে মেনে নেয় নি। সন্ধ্যা নিজের জীবনটাকে একটু পরিবর্তন করে নিতে চেয়েছে। তাই সে মিলনের সাথে দুঃখের সংসারে খুঁজে পেয়েছে সুখের শান্তি। সন্ধ্যা মিলনকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে, মিলন প্রথমে রাজি হয় না, তারপর অনেক চিন্তা করে মিলন বলে-

মিলন ।। হ হ ,লইয়া যামু। তুই যেইখানে যাইতে চাবি সেইখানেই লইয়া যামু। আরেকবার নাইলে জেলে জামু। একবার গ্যাছিলাম স্বদেশ কইরা, আরেকবার যামু মাইয়া চুরি কইরা। আয় আয় জলদি আয়।

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বার হলেও ভুলে যায়নি, মিলনকে স্বামী হিসেবে বরণ করতে হলে দরকার একটি মালা। সে জন্য নাটকে দেখি সন্ধ্যা একটি মালা নিয়ে এসে মিলনের গলায় পরিয়ে দেয়। মিলন হক চকিয়ে যায়-

মিলন ।। এইটা কি কল্লি সন্ধ্যা,এইটা কি কল্লি!

সন্ধ্যা ।। ঠিক করছি,মিলন দা । আমি কিছু বুল করি নাই।

মিলনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। সে ভাবতে থাকে। সন্ধ্যা যেন চরম একটি ভুল করে ফেলল। জীবন কে চিনতে গিয়ে যেন সঠিক সিদ্ধান্ত সে নিতে পারেনি। মিলনের ভাবনা শুরু হয়ে গেল সে সন্ধ্যাকে সুখি রাখবে কি করে? কিন্তু সন্ধ্যা টাকা পাওয়ার সুখ চায় না,চায় না ভালো খাওয়া দাওয়া।সে চায় সৎ স্বামীর সঙ্গে শান্তিতে থাকতে।

সুশীলা সন্ধ্যার এই বিয়েকে মেনে নিতে পারে নি। সে বিশ্বাসও করতে পারে না যে তার মেয়ে বংশের কুলে কালি দিয়ে কোন অজাতের সাথে বিয়ে করতে পারে। নাট্যকার সন্ধ্যার মুখ দিয়ে বলালেন-

সন্ধ্যা ।। দ্যাশ বা’ঙ্গলো, বাড়ী বা’ঙ্গলো, কপাল বা’ঙ্গলো তব আমাগো কুল বা’ঙ্গলো না মা । ...তোমারে জাইত কুল দেইখাই বিয়া দিছিল- জীবনে সুখ পাইছ কোনদিন?

সন্ধ্যা এই প্রশ্নটা তার মাকে করেনি, করেছে এই সমাজকে, যে সমাজ এই অর্থনৈতিক বৈষম্য ,জাতের ভেদাভেদ করেছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি রুখে দাঁড়িয়ে নিজের মতো করে বাঁচা যায় কিনা তার চেষ্টা করেছে ।প্রতিবাদী সন্ধ্যার কাছে মা সুশীলা অনেক বেশি নিষ্পৃহ। সন্ধ্যা যে জীবন বোধে দাঁড়াতে চেয়েছে অর্থনৈতিক কারণে তা আজ অবক্ষয়িত। মিলন সন্ধ্যাকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। কারণ মিলনের যক্ষ্ণা ধরা পড়েছে। ডাক্তার সাবধানে থাকতে বলেছে মিলনকে। তাই সে সন্ধ্যাকে মরণ পথের সঙ্গী করতে চায় নি। বরং মিলন চেয়েছে সন্ধ্যা বাঁচুক তার মতো করে। সন্ধ্যা মিলনকে কাপুরুষ বললে মিলন দুঃখ পেয়েছে কিন্তু নিজের কষ্টের কথা একবারও সন্ধ্যাকে বলেনি। বরং শেষ পর্যন্ত মিলন সন্ধ্যাকে বলেছে-

‘তব’তুই বাচ সন্ধ্যা, তব, তুই বাচ ...।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাগর থেকে ফেরা : একটি মানবিক আবেদন

তন্ময় মন্ডল

রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্য জগতে প্রেমেন্দ্র মিত্র(১৯০৪-১৯৮৮) এক বিশেষ নাম। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা ইত্যাদির সমন্বয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। বাল্য কালে সাউথ সুবারবন স্কুলে পড়ার সময়, সহপাঠী অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ও শিক্ষক রণেন পন্ডিতের প্রেরণায় তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রথমা’ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। যদিও এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ কাব্যের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে যায়। পরবর্তী কালে সমসাময়িক আধুনিক কবি জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তীর মতো; প্রেমেন্দ্র মিত্রও রবীন্দ্র প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হয়েছিলেন। এরপর তিনি একের পর এক কাব্য বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ গুলি হল- ‘সম্রাট’(১৯৪০), ‘ফেরারী ফৌজ’(১৯৪৮), ‘সাগর থেকে ফেরা’(১৯৫৬), ‘কখনও মেঘ’(১৯৬০), ‘হরিণ চিতা চিল’(১৯৬১), ‘অথবা কিন্নর’(১৯৬৫), ‘সঙ্গীর নিকটে’(১৯৭২) ইত্যাদি। ‘সাগর থেকে ফেরা’ কাব্যের জন্য তিনি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে অকাদেমী ও রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

কল্লোল যুগের শিল্পী হয়েও তিনি তাঁর কাব্যে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন চিত্রকে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে মানুষের মুক্তির কামনাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। মুক্তি কামনা করতে গিয়ে ঝরে পড়েছে বিক্ষোভ ও বেদনার সুর। তিনি চির লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত-দের জন্য স্বপ্নসর্গের অনুসন্ধান করেছেন। সেকারনেই অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন --“Premendra is a broken hearted dreamer, still hoping for the best from a revolution” প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিক্ষোভের সাথে নজরুলের বিদ্রোহের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার বলা যায় ইংরেজ কবি হুইটম্যানের আবেগধর্মী উচ্ছ্বাসও সেখানে লক্ষণীয়। আধুনিক জটিল জীবনের নৈরাশ্য ও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও দেখা যায় আশ্চর্যরকম ঋজু, স্পষ্ট ও বিকিরণধর্মী ভাব। কবিতা দুর্বোধ্য নয়, সহজ ও সরল ভাষা, ছন্দ, অলংকার, চিত্রকল্প, প্রতীক সব দিক থেকে তাঁর দক্ষতা লক্ষণীয়।

‘সাগর থেকে ফেরা’ কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ৩২ টি কবিতা রয়েছে। কবিতা গুলি হল- জোনাকি মন, তোমাকে চিঠি, সাগর থেকে ফেরা, দোকান, শিখর ছুঁয়ে নামা, কবি, আছে, শহর, জীবনানন্দ, হারিয়ে, আবিষ্কার, জীবনের গান, ধ্বনি, বরং, প্রবাদ, সত্য, শরৎ, জানা ও বোঝা, সূর্য-বীজ, দুপুর, সাধু, জং, ক্লান্ত, রাত-জাগা ছড়া, জর্জ বার্নাড শ, পালক, দ্বীপ, স্মৃতি, হ্রদ, দশানন, শ্রীরাম। এই কবিতা গুলির ছত্রে ছত্রে যুদ্ধোত্তর বিকলাঙ্গ সভ্যতার পরিচয় স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। একের পর এক সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা- মহামারি, মন্বন্তর, বিভিন্ন আন্দোলন, দেশ বিভাজন, দাঙ্গা ইত্যাদি সমাজ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ফলে মানব মনে এক ভয়াভয় অন্ধকারের সৃষ্টি হয়, মানুষ হয়েছিল অনেক বেশি স্বার্থান্বেশী, সুযোগ সন্ধানী। নিরীহ, নিরপরাধ মানুষ কালের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যন্ত্রণা দগ্ধ জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল। এই সময়ে অনেক কবি-সাহিত্যিক তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে মানব জীবনের দুঃখ, দুর্দশার চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং সঠিক পথের অনুসন্ধান দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

অন্ধকারময় ভয়াভয় জীবনের চিত্রটি ফুটে উঠেছে তাঁর ‘জোনাকি মন’ কবিতাটিতে। তিনি এই অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে মুক্তি চেয়েছেন। কারণ অন্ধকার মানুষকে শুধু দুঃখই দেয়, জীবনের সাফল্য আনন্দের মধ্যে, আর সেই আনন্দ ঘটে আলোক প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে। মনকে তিনি জোনাকির সাথে তুলনা করে বলেছেন-

“এ এক জোনাকি-মন

জ্বলে আর নেভে,

অন্ধকার পার হবে ভেবে,

ইতি উতি ধায়;’’

জোনাকির আলো স্থায়ী নয় কখনো জ্বলে আবার কখনো বা নিভে যায়। এই আলো অন্ধকার ময় জীবন আসলে কবির কাছে সেই সময়ের মধ্যবিত্ত সমাজেরই চিত্র। সেকারণে তিনি এই সামান্য আলোক বিন্দুর উল্লেখ করে বলেছেন-

“এ জোনাকি-মন জানি

কোন দিন পাবে না উত্তর।

চারি দিকে অন্ধ রাত্রি তামসী, দুস্তর,

মৌন নিরন্তর।”

কবি ‘জোনাকি’ নামক একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের সাথে মানুষের মনের তুলনা করে এক অপূর্ব চিত্রকল্পের সৃষ্টি করেছেন। গভীর অন্ধকারময় রাত্রিতে ক্ষুদ্র জোনাকির আলো যেমন চকিতের সৃষ্টি করে তেমনি গভীর অন্ধকারময় মনের মধ্যেও সৃষ্টি হয় আশার আলো। আর এই আশাই হলো জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। এখানেই এর যথার্থ সার্থকতা।

‘সাগর থেকে ফেরা’ কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা ‘তোমাকে চিঠি’ এই কবিতায় কবি মুক্তির কামনা করে ভীত হয়েছেন। যুদ্ধোত্তর সমাজের ক্ষুধা-ভয়-অন্ধতাকে সুনিপুন ভাবে তুলে ধরেছেন-

“এত ভিড় কিলবিল, ক্ষুধা-ভয়-অন্ধতা-তাড়িত।

এত গোল, দিশাহারা ধূলিধূম্র আকাশ বধির!

জর্জর হৃদয় তবু কি বিশ্বাসে সব কিছু সয়?

হিজিবিজি এ-প্রলাপ-এরও হবে প্রাঞ্জল অন্বয়।”

জীবন সমুদ্রে ভাসমান কবিকে কালের স্রোতে ভাঁসিয়ে নিয়ে যায় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। এরই মাঝখানে তিনি কখনো শুনতে পেয়েছেন শান্তির বানী, মুক্তির কামনা। ক্ষণিকের সুখ শান্তি দিলেও সেই শান্তির রাশ বেশী ক্ষণ স্থায়ী হবে না, কবি তা জানেন। কারণ সুখ-দুঃখ ভরা জীবনে সুখের পরেই দুঃখের আগমন অনাবশ্যক। তাই এই ক্ষণিকের মুক্তিকে চোরাবালি ভেবে কবি ভীত হয়েছেন। তিনি বলেছেন- ‘ভয় হয় শুধু/ তোমার আমার প্রিয় তারা/ যদি ভিন্ন হয়,’...... তুমি আমি দুজনেই/ চোরাবালি-মগ্ন স্বপ্ন জেনেছি অনেক।’ কবি আশাবাদী একদিন না একদিন এ সমস্ত কিছুর চির মুক্তি ঘটবে।

কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় কবিতা ‘সাগর থেকে ফেরা’, জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত কবি উপলব্ধি করেছেন- কালের সমূদ্রে ভাসমান থেকে জীবনের মানে খোঁজার কোন অর্থই নেই, আসলে জীবনই হল সত্য; কালের সমূদ্রে শান্তির বন্দর সত্যতেই বিরাজমান। তাই কবি বলেছেন-

‘…সময়ের নীলে শুধু

উদ্দাম অবিরাম আলপনা আঁকা,

কি যেন কি যেন ঠিক

মন দিয়ে জানতে না জানতে,

স্টিমার পৌঁছে যায়

আজ-কাল-পরশুর প্রান্তে।”

প্রেমেন্দ্র মিত্র মানবতাবাদকে বারবার কবিতার মধ্যে সৃজন করেছেন। নিজের ‘কাব্য প্রসঙ্গে’ তিনি লিখছেন-“পৃথিবী যদি সাময়িক উত্তেজনায় উদাসীনও হয় তবু কবিকে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। মানুষের সুর লাগানো তাঁদের কাজ কিন্তু সেই সঙ্গে যুগে যুগে মানবতার গভীর মর্মোদঘাটন করে জীবন সত্য ভুলতে না দেওয়াও তাঁদের দায়িত্ব। শেলী বলেছিলেন ‘Poets are the unacknowledged legislators of mankind’ কবির অতিশয়োক্তিকে মিথ্যা দম্ভ বলে উড়িয়ে দেওয়া বুঝি যায় না; যুগের মানুষ নানা কারনে উদভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু কবিকে তাঁর লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে। কারণ জীবনের পরম রহস্যের চাবি শুধু বুঝি তাঁর কাছেই।’’ কবি মাটির মানুষের কাছাকাছি থেকে তাদের হয়ে বিদ্রোহের সুর চড়িয়েছেন। কল্লোলের কালে তাঁর এই বিদ্রোহী সত্তা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নজরুলের বিদ্রোহের সুর ছিল সাম্যের, পুঁজিবাদীদের শোষণের বিরুদ্ধে কবি সুকান্ত হয়েছিলেন বিদ্রোহী, সত্যেন্দ্রনাথ গেয়েছেন মেহনতী মানুষের জয়গান আর শোষণের নগ্নরূপ দেখে যতীন্দ্রনাথ হয়েছেন দুঃখবাদী কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিদ্রোহ সত্তা ছিল অন্যরকম, তাঁর কবিতায় রয়েছে জীবনের আকুতি ও দ্বন্দ্বময়তা যা আন্যান্য কবিদের কাব্যের তুলনায় তাঁর কাব্যকে করে তুলেছে অনেক বেশী সুসমৃদ্ধ। কবি তাঁর ‘সূর্য-বীজ’ কবিতায় বলেছেন-

“ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা, মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা

একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা, শ্মশানের প্রান্তচর,

আবর্জনা- কুন্ড ঘিরে বীভৎস চীৎকারে

নির্লজ্জ হিংসায় তারা হানাহানি করে,-

‘মানুষ জন্তুর হুহুঙ্কার’ দিকে দিকে বেজে ওঠে!

তুমি কি তখনও নির্লিপ্ত নির্বিকার?”

এখানে জীবনের আকুতির কথাই বিশেষ ভাবে উঠে এসেছে। যুদ্ধ পরবর্তী কালে অনাহারী-নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের কাছে একমুঠো অন্ন ছিল স্বপ্নের অতীত, তখন অনাহারী মানুষ জন্তুর রূপ ধারণ করে। তারা অন্নসংস্থানের জন্য বেছে নেয় আবর্জনা-কুন্ড, ড্রেন ইত্যাদিকে। এক টুকরো খাবারের জন্য তারা করুণ আর্তনাদ আর হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। কবি তৎসময়ের এমন এক করুণ চিত্রকে ফুটিয়ে তুলে সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি আশাবাদী, এই দুর্দিনের অবশান ঘটানোর জন্য ‘সূর্যবীজ’ বা সূর্যাশের অনির্বাণ প্রাণশিখা প্রতিভাত হবে। কবির কল্পনায় – “দেশে দেশে মানব-সত্যের সে সংশপ্তক বাহিনী/আজও সাজছে নিঃশব্দে চরম সংগ্রামের জন্য।”

বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কারনে গ্রামের মানুষ দলে দলে শহরমুখী হতে থাকে বিংশ শতাব্দীর চার ও পাঁচের দশকে। ফলে আয়তনগত দিক থেকে শহরের পরিধির বিস্তার ঘটে। গ্রামের বহু মানুষ শহরের ব্যস্ত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে কবি ‘শহর’ কবিতায় বলেছেন-

“......হঠাৎ কখন নদীর ধারে ব্যাপারীদের নায়ে,

আমার শহর নেমেছিল কাদামাখা পায়ে

এই তো সেদিন, নারকেল আর খেঁজুর গাছের ঝোপে।

এই তো সেদিন, তবু যেন অনেক অনেক দূর,”

এখানে গ্রাম বাংলার প্রকৃতির আনন্দময় সৌন্দর্যের রূপটি ফুটে উঠেছে। কবি বারবার গ্রাম বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের পুণ্যভূমিতে হারিয়ে যেতে ছেয়েছেন। শস্য শ্যামলা ভরা প্রকৃতির আনন্দময় রূপ শহরের ব্যস্ত মানুষ অনুভব করতে পারে না। প্রকৃতি মানুষকে সহজ, সরল ও পবিত্র করে দেয়। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে অনেক মানুষ গ্রামছাড়া হয়েছেন কিন্তু গ্রামের আনন্দময় সৌন্দর্যের আস্বাদকে তারা কখন ভুলতে পারেনি। কবি শহরের মাঝখানে গ্রামের স্মৃতি বিজড়িত মাধুর্যকে বারবার মনের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই শহরকে কবির মনে হয়েছে- আমার শহর খানিক বুঝি/ ঝিমিয়ে পড়া তন্দ্রা থেকে জাগে।/ চিমনি-তোলা ঊর্ধ্বমুখে আকাশ পানে চেয়ে/ কিভাবে সে নিজেই জানে!/ ভেবে ভেবে পায় কি নিজের মানে?

প্রকৃতির অজানা রহস্যে যে মানুষ হারিয়ে যেতে চেয়েছে তার নেই মানা। শহরের কোলাহল, ব্যস্ত জীবন ও রাক্ষুসে সভ্যতার বাইরেও যে এক সুন্দর প্রাণময় জীবন আছে কবি তা মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি ‘ক্লান্ত’ কবিতায় লিখছেন-

“হে, পৃথিবী কোথায় যাব? ক্লান্ত।

আকাশে চাই, সেখানে উদ্‌ভ্রান্ত।

আমার মন, গহন বন ফুরায় না,”

রাক্ষুসে সভ্যতার জটিলতাময় জীবন পথ কবিকে ক্লান্ত করে দিয়েছে, তিনি যেখনেই যান উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরে আসেন। তাই কবির প্রশ্ন ‘হে, পৃথিবী কোথায় যাব?’ আবার তিনি এই পথেরও অনুসন্ধান দিয়েছেন তাঁর ‘হারিয়ে’ কবিতায়-

“কোন দিন গেছ কি হারিয়ে

হাট বাট নগর ছাড়িয়ে

দিশাহারা মাঠে,

একটি শিমূলগাছ নিয়ে

আকাশের বেলা যেথা কাটে?”

একটু নীলাকাশ, নিষ্কলুষ বাতাস, পাখি, পাহাড়, অরণ্য, ফুল, তৃণভূমি, মানুষের মনকে এক অনাবিল সৌন্দর্যের জগতে পৌঁছে দেয়। এই যন্ত্রের যুগে অবধারিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে কবি পাঠককে প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছেন। আকাশ অনন্ত তত্ত্বের প্রতীক আর শিমুলগাছ হৃদয়ের আশ্রয়ের প্রতীক। অনন্ততত্ত্ব মানুষকে করে তোলে প্রেমিক আর আশ্রয়ের অজানা রহস্যে মানুষ পৌছে যায় সঠিক ঠিকানায়। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ‘হারিয়ে’ কবিতায় এই তত্ত্বরেই উন্মোচন করতে চেয়েছেন। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন শহর। তাই ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে মানবিক আবেদনের জায়গাও রয়েছে অনেক বেশি। তাই কবি পাঠককে ঈশ্বরের সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম করতে চেয়েছেন।

‘সাগর থেকে ফেরা’ কাব্যগ্রন্থের শেষ দু’টি কবিতা ‘দশানন’ ও ‘শ্রীরাম’। দু’টি কবিতাই পৌরাণিক পটভূমিতে রচিত। বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্র পরম পূজনীয় পুরুষ, আর দশানন অত্যাচারী, অনাচারী, বীভৎস চরিত্র। পরবর্তী কালে কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখি দশানন আর্থাৎ রাবণ চরিত্রটি তুলনামূলক লঘু প্রকৃতির। রাবণ অত্যাচারী, অনাচারী, অহংকারী কিন্তু মৃত্যুর সময় রামের নাম মুখে এনেছেন, রামকে স্মরণ করেছেন। বস্তুত কৃত্তিবাসের ‘শ্রীরাম পাঁচালী’-তে রাবণ তাঁর প্রধান শত্রু রামকে যে ভক্তি করতো একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’(১৮৬১)-এ রাম ও রাবণকে বিপরীত ভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাল্মীকির যে রাম ছিল পরম পূজনীয় মধুসূদনের সেই রাম কাপুরুষ আর বাল্মীকির যে রাবণ ছিল কাপুরুষ মধুসূদনের সেই রাবণ উজ্জ্বল পৌরুষত্বের প্রতীক। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় রাম ও রাবণের প্রসঙ্গ এসেছে একটু অন্যরকম ভাবে। কবি এই দুটো চরিত্রকে নিজ নিজ গুনে, নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের শিরপা তুলে দিয়েছেন।

‘দশানন’ কবিতাটিতে দশানন অর্থাৎ রাবণকে কবি অদ্বিতীয় বলে অভিহিত করেছেন। রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু সীতার কোন অনিষ্ট করেননি। যুগ যুগ ধরে মানুষ এতদিন রাবণকে নীচ, হীন,অনাচারী ভেবে এসেছে কিন্ত কবির দৃষ্টিতে দশাননের অবস্থান সংকীর্ণ মানসিকতার অনেক উর্ধ্বে। কবির ভাষায়-

“তোমার বিশাল মূর্তি তারা চিরদিন

পঙ্কলিত করে করুক

এসবের বহু উর্ধ্বে তুমি অন্য অকাশে উন্মুখ।”

কবি আবার বলেছেন একদিক থেকে অর্থাৎ সংকীর্ণ মানসিকতা দিয়ে বিচার করে কারো সম্পর্কে মূল্যায়ণ করা উচিত নয়। সঠিক মূল্যায়ণের জন্য দশদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ বৃহৎ মানসিকতার প্রয়োজন। রাবণই প্রথম প্রয়াস করেছিলেন স্বর্গ আরোহনের জন্য সিঁড়ি তৈরি করার। যদিও এ প্রয়াস সফল হয়নি তবুও বলা যায় যে রাবণই একমাত্র রাজা ছিলেন যিনি স্বর্গকে সর্ব-সাধারণের মাঝখানে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করেছিলেন। রাবণের এই বাসনা অতৃপ্ত রয়ে যাওয়ার জন্য হয়তো তাঁর চিতা আজও নেভেনি। কবির ভাষায়।

“সোপান হয়নি গড়া,

স্বর্গ আজো দূর।

তোমার চিতার শিখা কিংবদন্তি-কল্পনায়

তাই বুঝি নিভেও নেভে না,

হে অতৃপ্ত পৃথ্বী-প্রাণ

শূন্যবৈরী শাশ্বত বিদ্রোহ!”

কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা ‘শ্রীরাম’। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় রামচন্দ্র পরম পূজনীয় চরিত্র। তারকা নিধন, অহল্যা উদ্ধার, চতুর্দশ বর্ষ বনবাস, সাগর লঙ্ঘন, সীতা উদ্ধার, রাবণ বধ তাঁর জীবনের মহান কর্ম ঠিকই কিন্তু এর চেয়েও বড় কর্ম নিষ্ঠা ও সত্যপালন আর এই সত্যের প্রতি আনুগত্যের জন্য রামচন্দ্র, সর্ব কালের, সর্ব যুগের মানুষের কাছে চির অমর হয়ে রয়ে গেছেন। তাই কবি বলেছেন-

“পিতৃসত্য, লোকসত্য,

সকলের সব সত্য পালনের পর

আপন গহন সত্য

খুঁজিবার রহে যেন কিছু অবসর।”

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, এই কাব্য গ্রন্থের কবিতা গুলির মধ্যে মানবিক আবেদন অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীর মতামতের উল্লেখ করতে পারি- “সাগর থেকে ফেরার সুর একটু আলাদা। প্রাণের সহজ আনন্দের উপলব্ধি বড় হয়ে উঠেছে এখানে। আকাশ-সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য-ব্যাপী নিসর্গের অবাধ বিস্তার; জীবনের সজীব ও প্রাণ-স্পন্দময় মুহূর্তগুলির সঙ্গে বাঁচাবার উল্লাসের এক নিবিড় সংযোগ রচনা করাই কবির লক্ষ্য এখানে।” গভীর জীবন বোধ, নগর কেন্দ্রীক জীবন সভ্যতার অভিঘাত, সাম্যবাদী চিন্তধারা, মননশীলতা, মূল্যবোধ সংশয় এবং তৎসঞ্চাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ এ সব কিছুর সমন্বয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘সাগর থেকে ফেরা’, বাংলা কাব্য সাহিত্যের জগতে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ-**

১) মিত্র প্রেমেন্দ্র, ‘সাগর থেকে ফেরা’, দে’জ পাবলিশিং -২০০০, কলকাতা- ৭০০০৭৩।

২) চক্রবর্তী সুমিতা, আধুনিক কবিতার চালচিত্র, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

৩) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত, বাংলা সাহিত্যের সম্পুর্ণ ইতিবৃত্ত, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রা.লি.-১৯৬৬ কলকাতা-৭০০০৭৩

৪) বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ, পাঠকৃতির নানা ভুবন বিশ্লেষণে ও আস্বাদনে, প্রজ্ঞা বিকাশ- ১৪১৭, কলকাতা-৭০০০০৯

৫) রায় রামরঞ্জন, প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি ও উপন্যাসিক, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯

৬) রায় রামরঞ্জন, গল্পের ভুবন : প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯

৭) রায় রামরঞ্জন, প্রসঙ্গ প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯

৮) মুখোপাধ্যায় বাসন্তী কুমার, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, প্রকাশ ভবন,১৯৯৪ কলকাতা।

৯) ভট্টাচার্য নমিতা, বাংলা সাহিত্য ও জাতীয় সংহতি, দিয়া পাবলিকেশন-১৪২১, কলকাতা-৭০০০০৯

তুলসী লাহিড়ীর ‘বাংলার মাটি’: এক ভাঙ্গা মনের কাহিনি

টুম্পা ব্যাপারী

বয়স্কদের মুখে শোনা নাড়ী ছেঁড়ার টানের কথা। দেশভাগের পর নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে শুধুমাত্র প্রাণকে সাথে করে দেশান্তর হওয়া। দেশভাগ নয় যেন মায়ের সঙ্গ থেকে সন্তানকে আলাদা করা। তা আবার সহজ সরল পথে নয়। রাজনৈতিক দাঙ্গা, হানাহানি,রক্তপাত, অকারণে ফাঁসিয়ে দেওয়ার নানা ঝঞ্ঝাট। কেউ পরিবারকে সাথে পেয়েছে কেউবা হারিয়েছে। কোন একটি ধর্মের মানুষকে এমনটা করতে হয়নি, হয়েছে সমস্ত ধর্মের মানুষকে বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়কে। তুলসী লাহিড়ীর ‘বাংলার মাটি’ যেন সেই দেশভাগ তথা মনভাগের উত্তম দলিল।

মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণু পরিবার। বৃদ্ধ,তার বউমা এবং একটি নাতি ও নাতনি । বাচ্চা দুটিকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে তুলতে চেয়েছেন বৃদ্ধ। কিন্তু বাধ সাধল রাজনৈতিক পরিস্থিতি । গতিময় জীবনে অকারণ শিথীলতায় ভেঙ্গে পড়েছেন বৃদ্ধ। আশা একমাত্র দীনের বন্ধু মধুসূদন।তুলসী লাহিড়ীর নাটকে সমাজ সমস্যার স্থান বিশেষ ভাবে দেখা যায়। তাঁর নিজের কথায় “সকল সার্থক নাটকেই message হিসাবে নাট্যকারের কিছু না কিছু বক্তব্য থাকেই । ”‘বাংলার মাটি’ নাটকে পূর্ব বাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) হিন্দু পরিবারের জীবন সমস্যার নানাদিক নাট্যকারের মনে উঠে এসেছে। তিনি অভিজ্ঞতার শিল্পী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের ভাব ও ভাবনা অন্বয় করে তিনি এই নাটকের কায়া ও কান্তি গঠন করেছেন । “এ নাটক সামাজিক , অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক যাইহোক না কেন এটা ভাঙ্গা বাংলার বর্তমান ভাঙ্গা মনের কাহিনী। বাংলা ভাগের পর থেকে যা দেখেছি শুনেছি ভেবেছি বুঝেছি তাই দিয়ে এ নাটক সাজিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আমার ভাবনা চিন্তার যতটুকু পেয়েছি তারো একটু ইঙ্গিত দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি”।

নাট্য কাহিনিতে হিন্দু ও মুসলিম দুটি সম্প্রদায়ের কথা উঠে এসেছে। উভয়ের সমাজ ও জীবনের আলো এবং অন্ধকারময় দিক দুটোই ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। সুখে দুঃখে পাশে থেকেছে কিন্তু মনের সেই সংস্কার,সংশয়, দ্বন্দ্বকে কখন কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই সময় যখন বেচাল তখন ঐ সব অন্ধকার গুলি ছেয়ে গেছে সম্প্রদায় গত ভাবে চারিদিকে। এর মূলে রয়েছে কায়েমি স্বার্থের চক্রান্ত, যা সাধারন মানুষের মনে বিদ্বেষ এনে দিতে চায়। ইংরেজ আমলেও হয়েছে,তার আগে আবার স্বাধীনতার পরেও। তবে সমাজের এমন কিছু মানুষও আছেন যাদের কাছে সমস্তটা পরিষ্কার,স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। সংসারের সেই সব শান্তিপ্রিয় মানুষের দল প্রতিবাদী হয়ে ওঠে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে।

নাটকটির চরিত্র আবুমিঞা, কালীদা,কিরণশশী ,লটকা,চিত্রা।আবুমিঞা আদর্শবাদী চরিত্র। চিত্রা নাটকের মূল কাহিনিকে ফুটিয়ে তুলেছে। লটকা চরিত্রটি আকর্ষনীয়। ছোট হয়েও সংসারের ছোট বড় সমস্ত সমস্যাকে যেন বুঝতে পারে,সমাধান করার সাহস পেয়ে যায়। তার মুখে শোনা যায় ঝুটার রাশি হটায়ে হাসি। সত্যিই তাই সমস্ত মানুষেরা যদি মিলে মিশে চলে তাহলে মিথ্যেকে কখনও বাড়তে দেওয়া যাবে না। হিন্দু মুসলিম দুই বাংলার মায়ের সন্তান। তার সমস্ত কাজে পাশাপাশি থাকবে শুভবোধকে যেমন গ্রহণ করবে তেমনি অন্যায়ের ও প্রতিবাদ করবে এমনই শিক্ষা দেন বাংলার মা। কিন্তু যখন তা ভুলে গিয়ে পরস্পরের ক্ষতি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তখন দেখা দেয় সংঘাত দ্বন্দ্ব লড়াই। নাট্যকারের মতে হিন্দু মুসলমানের আত্মিক বিভেদের পিছনে হিন্দু ধর্মের নামে কুসংস্কারের, আচার আচারনের অতি বাড়াবাড়ী দায়ী। তাই দেশভাগের পর যখন পূর্ব পাকিস্থানে মুসলমানরা অগ্রাধিকার পেল তখন সংঘাত শুরু হল। এই অশান্তির মূল কারন খুঁজতে চাইলে আবুমিঞা কালীবাবুকে বলেন-“সংস্কার টুকু তোমরা যদি জাঁক করে জাহির না কত্তে তাহলে দেশ জুড়ে এত লোকের এত অশান্তি বোধ হত না।”

চিত্রা ও নুরু প্রতিবেশী,পড়াশোনাতে ভাল। তবে দেশভাগের অস্তিরতা চিত্রার মত শিক্ষিত মেয়ের পড়াশোনার গতিকেও স্তব্ধ করে দিল। নুরু বি এ পাশ করেছে। আবুমিঞা যখন নুরুর পড়াশোনার প্রসঙ্গ তোলে তখন চিত্রার মুখে উচ্চারিত হয়-

চিত্রা ।। আমার আর ও সব খবরে কোন interest নেই।আমার পড়াশোনা তো বন্ধ।

শিক্ষিত মেয়ে পড়াশোনাকে জলাঞ্জলি দিলেও নিজের জীবনটাকে দিতে পারবে না ভেবে নুরুর সাথে পরামর্শ করে কলকাতায় চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাধ সাধল সেই রাজনৈতিক অরাজকতা। একটা সাধারন সম্পর্ককে রাজনৈতিক রঙে রাঙিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পূর্বাভাস তৈরি হল সেদিন।

একটি ভদ্র পরিবারের শিক্ষিত মেয়ে সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য ছাড়ানোয় আবু মিঞা দুঃখিত। দুঃখিত কালীবাবুও কিন্তু কারোর কিছু করার উপায় নেই।কিছু বললেই হয়ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে যাবে। আবু মিঞা চিত্রাকে বোঝে তাই সরাসরি নুরুকে বিয়ে করার কথা বলতে আত্ম সম্মানে বাধে। কিন্তু তিনি জানেন চিত্রা এ প্রস্তাবে রাজী হলে সমস্ত অন্ধকার কেটে যাবে।দুটি তরতাজা প্রান অকারণে মুষড়ে পড়বে না।

চিত্রা।। আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়াই progress.আমি নিজেকে progressive বলেই মনে করি।

আবু।। শুনে সুখী হলাম । তা হলে ভগবত ভক্তি যা উপলব্ধির সাধনা যখন নিতান্তই নিজের বিশ্বাসও সাধনার বিষয়, তখন আজকের যুগে , ধর্ম্ম নিয়ে দল পাকাতে তুই নিশ্চয় চাইবি না দিদি।

চিত্রা।। নিশ্চয় না।

আবু।। তবে তুই নুরুকে বিয়ে কর। শুনলি’ত নুরু বলে গেল, আমরা যা ভাল বুঝব তাই সে মেনে নেবে।

চিত্রা।। বিয়ে!

আবু।।সারা জীবন কেন মিছে কলঙ্কের জ্বালায় জ্বলবি?

চিত্রা।। সেই ভয়ে এই বিয়ে করতে হবে?

আবু।। ভয়ে নয়। সত্যকে গ্রহণ করবার সাহস থেকে মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা বাড়াবার জন্য তোকে এই বিয়ে করতে বলছি।

চিত্রা।। আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ইত্যাদির ভেতর সামাজিক ভাবে বিবাহ প্রচলিত নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বন্ধুত্ব বা অন্তরঙ্গতার কোনও বাধা’ত নেই ।

সমাজ অস্থির, মন অস্থির। রাজনীতির বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ল আপাত সুখী পরিবারটির মধ্যে। ফলত কালীবাবু দেশ ছাড়ার সংকল্প করলেন। যদিও সেটাকে পালানো বলা যেতে পারে । এতে সকলের মত ছিল । তিনি চেয়েছিলেন বাচ্চাদুটিকে নিয়ে সুখে থাকতে। নাটকীয় মোড়ে দেখা যায় লটকা ভাষা আন্দোলনে যোগদান করছে। নুরুর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজ সভ্যতাকে মুক্ত করতে এগিয়ে চলেছে।তখনি চিত্রার সম্বিত ফিরে আসে। সে সিদ্ধান্ত নেয়। সে দেশ ছেড়ে যাবে না। সে বলে ওঠে

“নানা\_ দিনের পর দিন, নিরঙ্কুশ অত্যাচার দেখে দেখে, আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আজ আমি দেখতে পাচ্ছি, এখানেও প্রতিবাদ আছে,অত্যাচার বাধা দেবার মানুষ আছে। দুঃখ কষ্ট নির্যাতনে আমি ভয় পাই না নানা। আমি মরে যাচ্ছিলাম আত্মার অপমানে। আজ ওরা লড়বে আর আমি পালাব?এ আমি পার্বনা কিছুতেই পার্বনা।”

একটু অন্যরকম চরিত্র সদানন্দবাবু। পেশাতে উকিল। শুধুমাত্র পেশাতে নয়। আইনের মার প্যাঁচে সাধারণ মানুষকেও ভয় দেখিয়ে বেড়ান তিনি।স্ত্রী মারা যাওয়ার পর চিত্রাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় চিত্রার না কিরণশশী দেবীর কাছে। সমাজের কাছ থেকে মেয়েকে নিরাপদে রাখতে তিনি এ প্রস্তাবকে মেনে নেন । তাই প্রায় সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি সদানন্দবাবুর পরামর্শ নেন । তার পরামর্শে কিরণশশী নুরুর বিরুদ্ধে মামলা করার কথা ভাবেন । আর এই ভাবাতেই এক প্রকার শুরু হয় হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব। দাঙ্গার ভয়ে সদানন্দবাবু পিছিয়ে আসেন। অন্যদিকে নুরুর সঙ্গে চিত্রার বিয়ের প্রস্তাব কিরণশশীর আত্মসম্মানে আঘাত হানে। কিন্তু তিনি কি করবেন। চারিদিকের অশান্তির আগুন তাকেও বিভীষিকা ময় করে তোলে। তাই শেষে তিনিও নিরুত্তর রয়ে যান।

নুরু ও লটকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে সরিক হওয়াটা চিত্রাকেও উজ্জীবিত করে। যদিও সে শিক্ষিত মেয়ে সে পারলে অনেক আগে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারত। ছোটদের এই এক হওয়ার মন্ত্রে আবুমিঞা ও কালীবাবু তাই এক হয়ে গেয়ে ওঠেন

বাংলার মাটি বাংলার জল

ধন্য হোক- ধন্য হোক -

**মৈমনসিংহ-গীতিকা : নায়িকার বারমাস্যা**

মনোজিৎ রায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিভিন্ন ধারার দিকে তাকালে একটা বিষয় নজরে আসবে তা হল নায়িকার বারোমাসের দুঃখের কাহিনি । বারমাস্যা বা বারমাসি [বার(১২)+মাস+ইয়া,ই] শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ হলেও এর মূল অর্থ প্রায় একই-কাব্যে নায়িকার বারমাসের সুখ-দুঃখের কাহিনি বর্ণনা করে লেখা কবিতা । বারমাসের সুখ-দুঃখ বর্ণনা স্বভাবতই একটি দীর্ঘ কাহিনির জন্ম দেয় ।

‘বারমাস্যা’ শব্দটিতে স্পষ্ট, নায়িকার বারমাসের সুখ-দুঃখের কাহিনি ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত হয়ে থাকে । কিন্তু, অনেক সময় চারমাস, ছয়মাস, আটমাস ,বা দশমাসের সুখের-দুঃখের বর্ণনাকেও ‘বারমাস্যা’ বা ‘বারমাসী’ বলা হয়ে থাকে । বারমাসী কবিতা বা কাব্যগুলিতে মূলতঃ নারীর বা নায়িকার সুখ-দুঃখের কাহিনি বর্ণিত হয়ে থাকে । বারমাস্যার কাহিনিতে দেখা যায় প্রেমিক-প্রেমিকার অথবা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের দুঃখই প্রধান হয়ে ওঠে । তবে অনেক সময় নায়কের বিরহে বিরহিনী নায়িকার ব্যাকুল বিলাপও বারমাস্যার আদর্শ কাহিনি হয়ে ওঠে । কবিরা তাঁদের কাব্যে বারমাসের কাহিনি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নারীচরিত্রের মনস্তত্ত্ব, সমকালীন সমাজচিত্র, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, লোকজীবন ও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়-উপাদানগুলি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত করে থাকেন ।

মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য থেকে বাংলা সাহিত্যে বারমাস্যার সূচনা-

“আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ । মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ।।

পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি ঊড়ী জাওঁ তথাঁ ।

মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথাঁ ।।কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ ।

এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস ।।

শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে । সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ।।

কত না সহিব রে কুসুমশরজালা । হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা ।।

ভাদর মাঁসে আহনিশি আন্ধকারে । শিখি ভেখ ডাহুক করে কোলাহলে ।।

তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞি মুখ । চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক ।।

আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী । মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুতিবেক কাশী ।। তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন । গাইল বড়ুদাস বাসলীগণ ।।’’[রাধাবিরহ]

উল্লেখ্য বাংলা সাহিত্যে নায়িকার চতুর্মাস্যার সৃষ্টির জনক বড়ু চণ্ডীদাস । এর পর একে একে ‘মঙ্গলকাব্য’ [বেহুলা, লহনা , খুল্লনা, সুশীলা,ফুল্লরার বারমাস্যা ], বৈষ্ণব পদাবলী [ রাধার বারমাস্যা], জীবনীসাহিত্য [বিষ্ণু প্রিয়ার বারমাস্যা], আরাকান রাজসভা [সতী ময়নার বারমাস্যা ], অনুবাদ সাহিত্য [সীতা, দৌপদীর বারমাস্যা] উল্লেখ যোগ্য । উল্লেখ্য বাংলা সাহিত্যে নায়িকার চতুর্মাস্যার সৃষ্টির জনক বড়ু চণ্ডীদাস । মধ্যযুগের অপর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’ । পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ)- এর অন্তর্গত গীতিকাগুলি আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত । পূর্ববঙ্গের একাধিক গীতিকায় নায়িকার বারমাস্য্যা বর্ণিত হয়েছে । উল্লেখ্য এই যে, পূর্ববঙ্গেরই অন্তর্গত মৈমনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতিকা গুলি ‘মৈমনসিংহ-গীতিকা’ নামে পরিচিত । উক্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত যে সমস্ত গীতিকাগুলির নায়িকার বারমাস্যার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে সেইগুলি বর্তমান নিবন্ধটিতে আলোচিত হল-

মৈমনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয় মলুয়া গীতিকা । রচয়িতার নাম জানা যায়নি । তবে অনেকের অনুমান পালাটির রচয়িতা চন্দ্রাবতী । কিন্তু, স্বয়ং দীনেশচন্দ্র সেন এই অনুমান মানতে চাননি । যাই হোক, ‘মলুয়া’ গীতিকার নায়িকা মলুয়া । বিরহ,মিলন,দ্বন্দ্ব,রোমান্স,প্রতারণা,ট্র্যাজেডি সব মিলিয়ে একটি অনন্য সাধারণ রচনা এই মলুয়া পালাটি । মলুয়া চরিত্রে রামায়ণের সীতার মিল খুঁজে পাওয়া যায় । রামায়ণে সীতার বারমাস্যা যেমন শ্রোতা ও পাঠককে ব্যাকুল করে তোলে তেমনি মলুয়ার বারমাস্যাও শ্রোতা বা পাঠককে অভিভূত করে । কাহিনি অনুসারে দেখা যায়, বিবাহের প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত মলুয়া পিতৃগৃহে পরম সুখে ছিল ; পঞ্চ ভ্রাতার বোন, ধনবান পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা সে । কিন্তু, ‘কপালে আছিল দুঃখ না যায় খণ্ডনে’[মলুয়া-(১৯) শেষ দৃশ্য] । বিধির বিধান খণ্ডানো বড় কষ্ট সাধ্য । মলুয়ার কপালের লিখনও অতি মর্মান্তিক । সতী-সাধবী-সীতা তুল্য মলুয়া নায়ক চাঁদ বিনোদের প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যায় । আর তখন থেকেই আরম্ভ হয়ে যায় মলুয়ার দুঃখ-যন্ত্রণা । যা ছাপিয়ে যেতে যেতে একটি সময় বারমাস্যার আকার ধারণ করে । বারমাস্যা শব্দটি ব্যাপকতর । বারমাস্যা কখনও নায়িকার সাংসারিক দাম্পত্য জীবনের অভাব অনটনের কারণে বর্নিত হয়ে থাকে যেমনটা পেয়ে থাকি ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে ফুল্লরার সাংসারিক দাম্পত্য জীবনের অভাব অনটনের বর্ননার মধ্য দিয়ে । আবার প্রিয়তমের সঙ্গে বিরহ বিচ্ছেদের কারণেও প্রিয়তমা বা নায়িকার বারমাস্যার উদ্ভব হতে পারে ; যেমনটা লক্ষ্য করা যায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার চতুর্মাস্যার বর্ণনার মধ্য দিয়ে । আলোচ্য গীতিকাটির নায়িকা মলুয়ার বারমাস্যা দুটি দিক থেকেই বর্ণিত হয়েছে-

প্রথমতঃ

অভাব অনটনের ছবি

‘’নাকের নথ বেচ্যা মলুয়া আষাঢ়মাস খাইল ।

গলায় যে মতির মালা তাও বেচ্যা খাইল ।।

শায়ণমাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে ।

এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে ।।

হাতের বাজু বান্ধা দিয়া ভাদ্রমাস যায় ।

পাটের শাড়ী বেচ্যা মলুয়া আশ্বিনমাস খায় ।।

কানের ফুল বেচ্যা মলুয়া কার্ত্তিক গোয়াইল ।

অঙ্গের যত সোনাদানা সকল বান্ধা দিল ।।

---------------------------------

মায়েরে না কইয়া বিনোদরাত্র নিশাকালে ।

বৈদেশে করিল মেলা পোষমাস্যা দিনে ।।’’

দ্বিতীয়তঃ

বিরহ জনিত যন্ত্রণার ছবি

‘’সূতা কাটে ধান ভানে শাশুড়ীরে লইয়া ।

এই মতে দিন কাটে দুঃখু যে পাইয়া ।।

মাঘ-ফাল্গুন গেল মলুয়ার ভাবিয়া চিন্তিয়া ।

চৈত্র-বৈশাখ গেল আশায় রহিয়া ।।

জ্যৈষ্ঠমাস আম পাকে কাউয়ায় করে রাও ।

কোন বা দেশে আছে বন্ধু নাহি জানে তাও ।।

আইল আষাঢ়মাস মেঘের বয় ধারা ।

সোয়ামীর চান্দ মুখ না যায় পাশরা ।।

মেঘ ডাকে গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে রইয়া ।

সোয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে শুইয়া ।।

শায়ন মাসেতে লোকে পুজে মনসা ।

এই মাসে আইব সোয়ামী মনে বড় আশা ।।

শায়ন গেল ভাদ্র গেল আশ্বিন মাস যায় ।

দুর্গাপূজা আইল দেশে শব্দ শুনা যায় ।।

মনের দুঃখ মনে রইল আশ্বিন মাস গেল ।

পূজার সময় কালেতে সোয়ামী ঘর না আসিল ।।‘’

আগেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে রামায়ণের সীতার সঙ্গে মলুয়ার অনেকাংশে মিল রয়েছে । রামায়ণের সীতা সমাজ দ্বারা প্রতারিত,রামের অনিচ্ছাকৃত সীতাকে প্রত্যাখ্যান,পরিশেষে সীতার স্বেচ্ছায় স্বামী-গৃহ ত্যাগ ও নিরুদ্দেশ যাত্রা মলুয়ার কাহিনিতেও দেখা যায় ।

‘কঙ্ক ও লীলা’ মৈমনসিংহ গীতিকার অপর একটি পালা । কঙ্ক এই গীতিকার নায়ক এবং নায়িকা লীলা গীতিকার আদ্যন্ত পাঠে দেখা যায় দুঃখ-যন্ত্রণার অংশই বেশি । প্রথম দিকে কঙ্কের জীবনের দুর্দশা পরে লীলার বিরহ-যন্ত্রণা শেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গীতিকার সমাপ্তি । এরই মাঝে বর্ণিত হয়েছে লীলার বারমাস্যা । লীলার বারমাস্যা বস্তুতঃ ষাণ্মাসিকী অর্থাৎ ছয় মাসের দুঃখ-দুর্দশা-বিরহ-বেদনার কাহিনি । লীলার দুঃখ-দুর্দশা ছয় মাসের হলেও তার আরম্ভ কিন্তু আগের থেকে এবং সমাপ্তি অনেক পরে । আর লীলার যে এই দুঃখ-দুর্দশা তার মূলে কিন্তু নায়ক কঙ্কর প্রতি লীলার অকৃত্রিম প্রেম-ভালবাসা । যে ভালবাসা লীলার যৌবন সমাগমের অনেক আগের থেকেই । লীলার জন্মদাতা পিতা(পরবর্তীতে কঙ্কর পালিত পিতা) পণ্ডিত গর্গের দয়ায় তাঁদের বাড়িতে কঙ্কের আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কঙ্কর প্রতি লীলার প্রেমের বীজ বপিত হয়েছে । লীলার মাত্র আট(৮)বছর বয়সেই কঙ্কের প্রতি তার হৃদয়ে বিরহ জনিত ব্যথা সঞ্চারিত হয়েছে-

‘’ঘর না ছাড়িয়া কঙ্ক থাকে যতক্ষণ ।

কঙ্কের বিরহে লীলার মন উচাটন ।।

দরদর দুনয়নে বহে জলধারা ।

কাজকাম ফেলি নীলা পন্থে রয় খাড়া ।।‘’

লীলার যৌবন সমাগমের পরে পরেই কঙ্ককে অজানা ঠিকানায় পাড়ি দিতে হয় । কঙ্ক বিরহে বিরহিণী লীলাবতীর কষ্টের আর শেষ থাকে না-

‘’অন্ন নাহি খায় লীলা নাহি ছুয়ে পানি ।

ভূতলে পাতিল শয্যা লীলা বিরহিণী ।।‘’

লীলার ষাণ্মাসিকী আরম্ভ ফাল্গুন মাস থেকে । সমাপ্ত শ্রাবণ মাস পর্যন্ত । মাঝে একে একে চৈত্র,বৈশাখ,জ্যৈষ্ঠ,আষাঢ় মাস ।

‘’দারুণ ফাল্গুন মাস গাছে নানান ফুল ।

মালঞ্চ ভরিয়া ফুটে মালতী-বকুল ।।‘’

চৈত্রের আগমনে গাছেরা সবুজ কচি পাতায় ভরে ওঠে । এমন দিনে লীলার বন্ধু নেই ঘরে-

‘’দারুণ চৈত্রের হাওয়া দূর হইতে আসে ।

আমার বঁধু এমন কালে রৈয়াছে বিদেশে ।।‘’

আসে নতুন বছর,বৈশাখ মাস, লীলাবতীর শরীর প্রচণ্ড রোদে দগ্ধ-

‘’এহিত বৈশাখ মাস অতি দুঃসময় ।

দারুণ রৌদ্রের তাপে তনু দগ্ধ হয় ।।‘’

জ্যৈষ্ঠ মাস দীর্ঘ দিনের মাস । দিন যায় মাস যায় । কিন্তু লীলাবত্তে শুধু কেঁদে যায়-

‘’নিত্য আসে নব পাখী নূতন ভ্রমর ।

কান্দিয়া সুধাইলে কেহ না দেয় উত্তর ।।‘’

জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হয় আসে আষাঢ় মাস । লীলার মনে বাড়ে নতুন আশা-

‘’আষাঢ় মাসের কালে আশা ছিল মনে ।

অবশ্য আসিবে বঁধু লীলা-সম্ভাষণে ।।‘’

শ্রাবণ মাসে আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন । ময়ুর-ময়ুরী মিলনে আত্মহারা । কদম গাছে ফোটে ফুল । শোভা বাড়ায় বর্ষার । অথচ এমন দিনেও লীলাবতী বন্ধুহারা-

‘’শ্রাবন আসিল মাথে জলের পসরা ।

পাথর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া ধারা ।।‘’

‘কমলা’ পালাটি আদৌ মৈমনসিংহ অঞ্চল থেকে পাওয়া যায় কি না তা নিয়ে স্বয়ং দীনেশচন্দ্র সেনই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । তবে তিনি অনুমান করেছেন মৈমনসিংহ সদর সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত হালিয়াঘাট নামক স্থানেই কাব্যে বর্ণিত ‘হুলিয়া’ । পালাটির প্রণেতা দ্বিজ ঈশান । কমলা ‘কমলা’ গীতিকাটির নায়িকা । কাহিনি অনুসারে দেখা যায় খল চরিত্র কারকুনের প্রেম নিবেদনে রাজী না হয়ে কমলাকে তার কোপে পড়তে হয় । বাবা-মা-ভাইকে নিয়ে কমলার সুখের জীবন । কিন্তু, কারকু্নের ছলা-কলায় পড়ে বাবা-ভাই-মাকে ত্যাগ করে অজানার পথে নামতে হয় । ঘটনাচক্রে মহিষালের গৃহে ঠাই এবং রাজকুমার প্রদীপের ভালবাসা পরে তাকে জীবনদেবতা রূপে বরণ । কিন্তু প্রকাশ্যে নয়, মনের গোপন অন্তরে । নারীর একটি চিরন্তন স্বভাব লক্ষ্য করা যায় এই কমলার মধ্যে । কমলার বয়ান-

‘’বুক ফাটিয়া যায়রে বন্ধু আরে বন্ধু মুখ ফুটিয়া না পারি ।

অন্তরের আগুনে আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি ।।‘’

রাজকুমারের অনেক অনুরোধেও প্রথমত কমলা আত্মপরিচয় দিতে রাজী হয়নি । পরবর্তীতে কমলা আত্মপরিচয় দেয় বারমাস্যার আদলে । যে পরিচয়ে কমলার অন্তরের গভীর বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে । কমলার বর্ণিত বারমাস্যার(বারমাসী) কাহিনির কয়েকটি পংক্তি নিম্ন রূপ-

১) ‘’হাসিয়া খেলিয়া দেখ পৌষ মাস যায় ।

পৌষ মাসের পোষা আন্দি সংসারে জানায় ।‘’

২) ‘’পোষ গেল মাঘ আইল শীতে কাপে বুক ।

দুঃখীর না পোহায় রাতি হইল বড় দুঃখ ।‘’

৩) ‘’জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দেখ পাকা গাছের ফল ।

রাত্রিদিবা না শুকায় নয়নের জল ।।‘’

‘দেওয়ান মদিনা’ গীতিকাটি পাঠ করলে দেখা যায় দুঃখ-যন্ত্রণার মর্মান্তিক দুটি আপাত পৃথক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে । যদিও কাহিনি দুটি গভীর ভাবে সম্পর্ক যুক্ত । আলাল দুলাল দুই ভাই শৈশবকাল থেকেই মাতৃহারা, সতিন মায়ের দ্বারা প্রতারিত । কয়েক দিন ইরাধরের বাড়িতে আশ্রিত থেকে আলাল ,তার ছোট ভাই দুলালকে সেখানে রেখে পালিয়ে যায় দেওয়ান সেকেন্দারের কাছে । আলাল-দুলালের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনরায় মিলন হয় বড় ভাই আলালেরই আন্তরিকতায় । ইতিমধ্যেই দুলাল বিবাহ করেন ইরাধরের কন্যা মদিনাকে । আলাল ভাই দুলালকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে মদিনার সঙ্গে তালাকনামা লিখিয়ে ত্যাগ করতে বাধ্য করে । গীতিকাটির নায়ক কে তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও থাকতে পারে তবে নায়িকা যে মদিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । প্রিয় স্বামী দুলালের কাছ থেকে আকস্মিক তালাকনামার খবর পেয়েই আরম্ভ হয় মদিনার আত্মযন্ত্রণা । যার পরিণাম জ্ঞানশূন্য তা থেকে মৃত্যু বরণ । শিশুপুত্র সুরুজ জামালকে নিয়ে স্বামী পরিত্যাক্তা মদিনার যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে ‘দেওয়ান মদিনা’য় অনেকটা বারমাস্যার ধাঁচে ।

‘দেওয়ান ভাবনা’ পালাটির নায়িকা সুনাই । মাত্র দশ(১০)বছর বয়েসই তার পিতার মৃত্যু হয় । ফলে শৈশব থেকেই সীমাহীন অভাব-অনটনের শিকার হতে হয় তাকে । মা ছাড়া তার দ্বিতীয় সম্বল নেই। যদিও আছে মামা, কিন্তু রক্ষকই ভক্ষক । সুনাইর বিবাহকাল সমাগত হলেও মা তাকে উপযুক্ত বরের হাতে সমর্পণ করতে পারেনি । এরই মধ্যে নায়ক মাধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সুনাইর । প্রথম দর্শণেই একে-অপরের প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি হয় । দুজনার প্রেমের পুর্ণ বিকাশের আগেই সুনাইর উপর কুনজর পড়ে গীতিকাটির খল চরিত্র দেওয়ান ভাবনার । তার অত্যাচারের শিকার হতে হয় একে একে মাধবের বাবা,মাধব এবং সুনাইকে । প্রথম দুজন জীবন নিয়ে ফিরতে পারলেও সুনাইকে পরোক্ষভাবে অকালমৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় স্বয়ং দেওয়ান ভাবনা । কাহিনির শেষাংশে সুনাই আত্মহত্যা করে । অবশ্য এই আত্মহত্যার পিছনে আছে সতী-সাধবী, নিঃস্বার্থবাদী বাঙালি রমনীর মনোভাব । যে কিনা স্বেচ্ছায় পারে প্রাণবন্ধুর জীবন বাঁচাতে নিজ হাতে কীটনাশক বিষ মুখে তুলতে । সুনাইর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কাহিনির যবনিকা পড়ে । তার অনেক আগের থেকেই আরম্ভ হয় সুনাইর বারমাসের লাঞ্চনা । যাকে রচয়িতা চন্দ্রাবতী নাম দিয়েছেন ‘সুনাইর বারমাসী’। বারমাসী বর্ণনায় অসাধারণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন কবি । সুনাইর বারমাস্যার সূচনা আষাঢ় মাসে সমাপ্তি জ্যৈষ্ঠ মাসে । মাঝে আরও দশ মাস [শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ] । সব মিলিয়ে মোট বার(১২)মাস । যা আদর্শ বারমাস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে । বারমাস্যার কয়েকটি পংক্তি নিম্নে তুলে ধরা হল-

১) ‘’আষাঢ় মাস গেল দূতী এইনা আশার আশে ।

কোথায় গিয়া পরাণের বন্ধু রইলা বৈদেশে ।।‘’

২) ‘’চৈত্র মাসেতে দূতী বহিছে চৈতালি ।

দেশে না আসিল বন্ধু হইলাম পাগলী ।।‘’

৩) ‘’জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দূতী গাছে পাকনা আম ।

কপাল বাইয়া পড়ে কন্যার জ্যৈষ্ঠমাস্যা ঘাম ।।‘’

মৈমনসিংহ-গীতিকার একটি অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা নায়িকার বারমাস্যা । যা একাধিক পালায় বর্ণিত হয়েছে । বারমাসী বর্ণনায় একদিকে যেমন কবিত্ব শক্তির পরীক্ষা হয়, তেমনি কোনও দেশের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ঘর-বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ধর্ম-সংস্কার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, ঋতুবৈচিত্র্য, সর্বোপরি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান লক্ষ্য করা যায় ।

তথ্যসূত্র– ১) ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

২) ‘বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র’- অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ।

৩) ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)- দীনেশচন্দ্র সেন ।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার** – অধ্যাপিকা ব্রততী চক্রবর্তী, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে শ্রমিকশ্রেণি

আশিস রায়

গভীর অন্ধকারের জীবন

‘ওদের দিনগুলোকে গিলে খায় কারখানাটা, আর দেহের শক্তি নিংড়ে যতটা পারে শুষে নেয় যন্ত্রদানব। একটা একটা করে দিন এমনি করে যায়, একেবারে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আর পৈঠে করে মানুষগুলোর পা এগোয় কবরের দিকে’। শ্রমিক শ্রেণির এই সংজ্ঞার মূল উক্তিটি করেছেন গোর্কি। ‘শ্রম’ ছাড়া পৃথিবীতে যাদের কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নেই, ভোর না হওয়ার সাথে সাথে মালিকের উপাসনায় যাদের জীবন অতিবাহিত হয়। সেই উপাসনার প্রাপ্তফল হিসাবে তাদের কপালে জোটে নীতিহীন অবিচার আর অত্যাচার, যে অবিচারের প্রতিকারের জন্য আদালত নামক কোন বিচারক্ষেত্র নেই, যারা রোলারের পেষণে ছিবড়ে হয়ে মানব সভ্যতার ইতিহাস নির্মাণে ব্যস্ত-তারাই শ্রমিকনামে মানব সমাজে চিহ্নিত।

শুরুটা অনেক আগের

‘১৪শ থেকে ১৫শ শতকে ইউরোপ মহাদেশে পুঁজিতান্ত্রিক ধরনের উৎপাদনের প্রথম অঙ্কুরোদগমের সূচনার সময় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গর্ভে শ্রমিকশ্রেণির পূর্ববর্তীশর্ত পুঞ্জীভূত হয়’। এই পুঞ্জীভূতরূপটি বিকাশ লাভ করে আস্তে আস্তে। আর এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভব হয়। দেখা যায়—‘১৭৬০-১৮৪০ সালে যে শিল্পবিপ্লব ঘটে মূলত তার পরেই পরস্পর বিরোধী দুটি শ্রেণির জন্ম হয়। একটি বুর্জোয়াশ্রেণি অপরটি শ্রমিকশ্রেণি’। শ্রমিকশ্রেণি ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল তারা অপর শ্রেণি দ্বারা শোষিত হচ্ছে। তারা প্রতিবাদ শুরু করেছিল কিন্তু তা দলগত ভাবে নয়, ব্যক্তিগত ভাবে। এই ভাবে তারা যে তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, সে চেতনা তাদের উদ্ভূত হয়নি।

শ্রমিক ও মালিকের বিরোধীতা শুরু হয়েছিল প্রথম ইউরোপে। কিন্তু ভারতবর্ষে শুরু হয় আরো অনেক পরে। ১৮১৮ সালে কলকাতার কাছেই হাওড়ার বাউড়িয়ায় ফোর্ট গ্লাসটার মিলস নামে সূতাকল স্থাপিত হয়। সেই সূতাকল শ্রমিকরা পরবর্তীকালে তাঁদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেন। এটাই প্রথম শুরু। এরপর শুরু হয়েছে একাধিক আন্দোলন। ১৮৮২ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে আট বছরে বিভিন্ন সূতাকলে ২৬ বার ধর্মঘট হয়। দীর্ঘদিনের অবিচার, অত্যাচার এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নানাবিধ গলদকে সামনে রেখে শ্রমিক তাদের দাবি আদায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

**শ্রমিকরাও মানুষ**

দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন নাটকে শ্রমিকদের যে দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ তুলে ধরেছেন সেখানে শ্রমিক শ্রেণির গুরুত্বকে তিনি বিশেষ নজরে দেখেছেন। এই শ্রেণির নাটকগুলির মূলগত সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সহায়ক বিষয় এনে বিকল্প পথের সন্ধান দিতে পারতেন। কিন্তু লক্ষ করলে দেখতে পাব সেই কাজে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমিক শ্রেণির সহায়তা নিয়েছেন। এর হয়তো বা দুটো কারণ থাকা সম্ভব। এক তাঁর শ্রমিকদের প্রতি আলাদা দরদ। আর দুই সহায়ক হিসেবে শ্রমিকরা অনেক বেশি বিশ্বস্ত।

দিগিন্দ্রচন্দ্র মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী হওয়ায় তাঁর নাটক শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের তত্ত্বের দিকটি ফুটে উঠেছে। নাটক রচনার শুরু থেকেই তিনি এই ধরণের নাটক রচনা করার জন্য মনোনিবেশ করেন। নতুন ধরণের নাটক রচনায় ‘গণ’ চেতনাকে প্রাধান্য দিতে নাট্যকারগণ সর্বহারার জীবনকে গুরুত্ব সহকারে নাটকে তুলে ধরেছেন। কারন’ ৪০ উত্তর বাংলা নাটকের মূলগত দিকটি ছিল সর্বহারা মতাদর্শ। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন—‘চল্লিশের দশকে বাংলা নাট্যজগতে যে নবতরঙ্গের সূত্রপাত হয় তার মূলে ছিল কোন প্রেরণা। তার মূলে ছিল Proletarian Humanism বা সর্বহারা মানবতাবোধ, একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে’। দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর নাটকে দেখাতে চেয়েছেন সামগ্রিক মানবমূর্তি শুধু শ্রমিকদের মুক্তি নয়। একথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার সবার আগে। পৃথিবীতে শ্রমজীবীদের অবস্থান কী? অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তর দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর নাটকে করেছেন। তিনি শ্রমিক শ্রেণির দুঃখে সমব্যথী ছিলেন। তিনি বলেছেন- ‘সাধারণ মানুষের প্রতি অবিচল আনুগত্যই আমাকে শক্তি জোগায়; আমার সহ্যগুণ বাড়িয়ে দেয় হাসিমুখে দুঃখকে জয় করবার শক্তি অর্জন করি। অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের মিছিলেই আমার স্থান—তাদের বেদনায় আমার বিষাদ, তাদের জয়ে আমার উল্লাস’।

নাট্যকারের যে সমস্ত পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক নাটকে শ্রমিক শ্রেণির নানারকম কার্যকলাপ উঠে এসেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোর্কির ‘মা’ নাটক (অনুবাদ), ‘অন্তরাল’, ‘মশাল’, ‘মোকাবিলা’, ‘অমৃতসমান’, ‘পূর্ণগ্রাস’ প্রভৃতি এবং একাঙ্ক নাটকের মধ্যে ‘বাঁধ ভেঙে দাও’, ‘গোলটেবিল’, ‘আপেক্ষিক’। এই সমস্ত নাটকগুলিতে তিনি সরাসরি শ্রমিকদের নানারকম অসুবিধা এবং তা থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দিয়েছেন। নাটকগুলিকে আলোচনা করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

**ভুলি নাই ইহাদের**

‘পূর্ণগ্রাস’ নাটকটি একটি বস্তিকে কেন্দ্র করে রচিত। নাটকের প্রথমেই নাট্যকার জানিয়েছেন –‘পাশে ঘর গরীব মধ্যবিত্ত সুখে দুঃখে এই বস্তিতে কাল কাটায়। জমিদার নোটিশ দিয়েছেন, বস্তি থেকে সবাইকে উঠে যেতে হবে—জমি তাঁর প্রয়োজন’। শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে বস্তি উচ্ছেদে সামনে থেকে লড়াই করে মাধব। মাধব কারখানায় কাজ করে। পঁত্রিশ বছর বয়স। বেলা ন’টার মধ্যে তাকে কাজে হাজির হতে হয়। জমিদার পুলিশ বাহিনি নিয়ে বস্তি উচ্ছেদে গেলে মাধবের ছেলে মারা যায়। ‘খোকা’র নিথর দেহ দেখে সে উচ্চারণ করে—মাধব ‘(অশ্রুসিক্ত লোচনে) চোখ মেলবে না... খোকা আমার চোখ মেলবে না!... (আত্মসংবরনের চেষ্টা করে) না না, কান্না নয়, কান্না নয়, প্রতিশোধ... প্রতিশোধ...’

‘অমৃতসমান’ নাটকের মূল কাহিনি থেকে সহায়তা করেছে ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী শ্রমিক নেতা সনৎ। শ্রমিক আন্দোলনকে পিছন থেকে নষ্ট করে দেওয়ার প্রক্রিয়া চালিয়েছে বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিনিধি জয়রাম। এই কুমতলবকে ধরে ফেলেছে সনৎ। তাঁর বক্তব্য—

‘সনৎ--না না, ডাকলেও শালারা ইউনিয়নের ধারে কাছে আসবে না, বাইরে থেকে হামলা করবে। দোষটা এসে পড়ে ইউনিয়নের ঘাড়ে। ম্যানেজারের ধারণা ইউনিয়নই সব করাচ্ছে। সারাটি দিন এ নিয়ে ঝামেলা চলে। কারা করাচ্ছে আমি জানি। আমাদের ইউনিয়নটার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে একটা পাল্টা ইউনিয়ন দাঁড় করাতে চায়। সেটি আর হচ্ছে না’।

নাটকের মূল আকর্ষণ ট্রেড ইউনিয়ন বা তার কার্যকলাপ না হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে শ্রমিক নেতা সনৎ মূল ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন ভাবে শ্রমিক শ্রেণির শক্তিকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাট্যকার প্রয়োগ করেছেন জোরালো ভাবে।

**অটুট বন্ধন কখনো না ভুলি**

‘মশাল’ নাটকটিতে সাম্প্রদায়িক রোষানলে শ্রমিক শ্রেণি আক্রান্ত হয়েছে। কলকাতার অদূরেই একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে দাঙ্গাকারীদের যে বিরোধীতা হয়েছিল তাকেই নাটকের বিষয়বস্তু করে নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন। ‘নাটকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পদ্ধতিরই যেন নির্দেশ দিতে চেয়েছেন তিনি। ... ‘মশাল’ তাই পাক ভারত সমস্যাকেই শুধু আলোকিত করবে না, আলোকিত করবে শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যাকেও। ‘মশাল’ জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যারও নাটক’। নাটকে ম্যানেজার শ্রমিকদের একত্রে সংগঠিতভাবে থাকতে দিতে চায় না। ক্ষমতা দিয়ে ম্যানেজার শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে চেয়েছে বারে বারে আর শ্রমিকরা নানা রকম দাবি নিয়ে মালিকের কাছে দরবার করেছে বিদ্রোহ করেছে। শ্রমিক ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য ম্যানেজার একটি সহজ পথ বেছে নিয়েছে তা হল দাঙ্গা। ম্যানেজারের কুমতলবে শ্রমিকরা বিভাজিত। শ্রমিকদের মধ্যে ভয়ের দাবানল ঢুকিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি সম্পূর্ণভাবে সফল। কিন্তু দিগিনবাবু জীবনের কাছে আত্মসমর্পণে নারাজ। তিনি বলেছিলেন—‘প্রতিকূলতার কাছে মানুষ যদি আত্মসমর্পণ করতো তবে মানবজাতি অবলুপ্ত হয়ে যেত কোন স্মরণাতীত কালেই’।

নাটকে শ্রমিকনেতা মতিকেও সেই ভাবে তৈরি করেছেন।

কারখানার মধ্যে শ্রমিকরা আজ দুটি ভাগে বিভক্ত। মতি অনেকটাই দুশ্চিন্তায়। মতির বিশ্বাস তলানিতে ঠেকেছে। এই সময়টা তার কাছে কেবলই অন্ধকার। এমতবস্থায় শোভনলাল, জালাল, লালমোহন, শঙ্কর প্রত্যেকে বিষণ্ণ মতির কাছে উপস্থিত হয়েছে শান্তি মিছিলের জন্য। হঠাৎ করেই মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ হয়-

‘মনোহর। সর্বনাশ, সর্বনাশ শঙ্কর, সর্বনাশ!

শঙ্কর। কি, কি হলো মনোহর, কি কি?

মনোহর। শোভনলাল খুন, শোভনলাল খুন হয়েছে!’

শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করা যেমন সম্ভব, আবার তারা একত্রিত হয় অতিদ্রুত। শোভনলালের মৃত্যুর পর বিরুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সকল শ্রমিক একছাতার তলায় চলে আসে। শোভনলালের দেহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছে-

‘ শঙ্কর—এসো মতি, শোভনলালকে ছুঁয়ে আমরা সবাই

শপথ করি- যারা ঘর পোড়ায়, মায়ের কোল শূন্যকরে

মানুষের বুকে ছুরি মারে, গুলি চালায়- স্বার্থের জন্য

গরীবের তাজা রক্তে হাত রাঙায়—সেই রক্তশোষা

দুষমনদের বিরুদ্ধে হবে আমাদের শেষ লড়াই...’

শ্রমিকশ্রেণি শেষ পর্যন্ত দাঙ্গাকারীদের পরাস্ত করে শান্তি স্থাপন করেছে। এর জন্য শ্রমিকরা আলাদা করে কোন সাহায্য পায়নি। একদিকে যেমন শান্তি স্থাপিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি শ্রমিক ঐক্য আরো দৃঢ় হয়েছে।

লড়াই করে বাঁচি

মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সমস্যা অবলম্বনে নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘মোকাবিলা’

নাটকে বিশ্বনাথ বাবুর পরিবারকে গ্রহণ করেছেন। নাটকে দেখা যায় বিশ্বনাথবাবু চব্বিশ বছর ধরে একটি কারখানার বিশ্বস্ত কর্মচারী। যুদ্ধের সময় কালোবাজারী করে কালীনাথ হঠাৎ কারখানার মেজোরিটি সেয়ার কিনে নেয়। কারখানার দায়িত্ব নিয়ে কর্মচারীদের দিয়ে একটি বণ্ডে সই করাচ্ছেন। বিশ্বনাথবাবু সই করিয়ে নেওয়া বিষয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন, কিছুদিন পরেই চিন্তা বাস্তব রূপ নেয়। কালীনাথের পরিস্কার বক্তব্যঃ ‘কারখানায় থাকতে গেলে হয় দাসখত দাও, না হলে কারখানা থেকে বেরিয়ে যাও’। কিছুদিনের মধ্যেই কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ জমতে থাকে। নারী পুরুষ মিলিত কন্ঠে স্লোগান দিতে থাকে—‘লক-আউট, তুলে নাও... কারখানা খুলে দাও’।

বিশ্বনাথবাবু সমস্ত শ্রমিকদের ডেকে বলেন দাসখত দেওয়ার যে চিঠি কালীনাথ প্রত্যেকের বাড়িতে পাঠিয়েছিল আজ কালিনাথের বাড়ির সামনে তার বহ্নি উৎসব হবে। এর মাঝে সনাতন কালিনাথের বাড়ি ঢুকে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালে, কালীনাথ সনাতনকে বেদম প্রহার করে। তার রক্তপাত ঘটে। তবু সনাতনের উক্তি—

‘সনাতন—না, না ভয় নেই। ... মরে যারা আছে... তারা এত সহজে মরে না। ...(হাতে কপালের রক্ত মুছে) যাই আমি যাই... গিয়ে সবাইকে বলি... খিদের কথা জানাতে গিয়েছিলাম... এই পেয়েছি... দ্যাখো এই পেয়েছি’।

বাইরের উন্মত্ত জনতা কেউ খালি হাতে ফিরে যাবার জন্য আসেনি। উন্মত্ত জনতার কাছে কালীনাথ পরাজয় স্বীকার করে। আহত সনাতনকে সে পুনরায় ডেকে পাঠায়। সে কারখানা খুলে দিতে বাধ্য হয়—

‘কালীনাথ- যাও সনাতন, তোমাদেরই জয় হল। কারখানা খুলবে।

সনাতন- খুলবে?

কালীনাথ- হ্যাঁ, খুলবে আর ছাঁটাই আপাতত বন্ধ রইল’।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাটকে লক-আউট এবং ছাঁটাই-এর প্রশ্নে মালিক পক্ষের পরাজয় ঘোষণা করেছেন। শ্রমিক আন্দোলনের কাছে মালিক পক্ষ পিছু হটেছে। একই রকম দৃশ্য পাই ‘অন্তরাল’ নাটকেও।

‘অন্তরাল’ নাটকে দুটি মিলের প্রসঙ্গ এসেছে। একটি বঙ্গমাতা মিল, অন্যটি কল্পতরু মিল। দুটি মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। একটি মিলের নেতৃত্বে আছে রনেশ ব্যানার্জী, অন্যটির দায়িত্বে সুবিনয়। বঙ্গমাতা মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে মালিক পক্ষকে অনেকটাই জব্দ করে ফেলেছে। শ্রমিকরা মিছিল করে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসছে। তাদের দাবি দাবা আদায় হয়ে গেছে এজন্য তারা গান গাইছে—

‘মোরা সর্বহারার দল

নির্ভয়ে চলি আমরা,

একতাই প্রাণে বল’।

অন্যদিকে কল্পতরু মিলের চেহারা অন্যরকম। মালিক পক্ষ কোন দাবি মানতে নারাজ। সেখানে সুবিনয়ের নেতৃত্বে শ্রমিকরা আন্দোলনে সামিল হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পাওয়া যায়—

‘সীতাংশু— খবর মারাত্মক।

রণেশ— মারাত্মক!

সীতাংশু - ... কল্পতরু মিলে গুলি চলেছে।

রণেশ— গুলি!

সীতাংশু— হ্যাঁ, গুলিতে চারজন নিহত আর জন দশেক আহত হয়েছে। পারলুম না, কিছুতেই ধর্মঘটীদের শান্ত রাখতে পারলুম না। পুলিশ দেখে তারা ক্ষেপে উঠল—ঠিক সেই সময় কোত্থেকে পুলিশের উপর পড়লো গোটা কতক ইট পাটকেল আর অম্নি গুলি। সবচাইতে শোচনীয় ব্যাপার, সুবিনয়ও ...’

আন্দোলনের জোরে সুবিনয়ের মৃত্যু ঘটেছে। এই নাটকে নাট্যকার শ্রমিক আন্দোলনকে ব্যবহার করেছে নাটকের প্রয়োজনে। শ্রমিক আন্দোলনকে মূল হিসাবে তুলে ধরার জন্য নয়। দুটি মিলের আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিকদের দাবি ও সুবিনয়ের মৃত্যুর পর আর কোন শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে ঘটনা নাটকে আসেনি। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের মতে—“মিল, ফ্যাক্টরী, কারখানা ইউনিয়ন প্রভৃতি ‘অন্তরাল’ নাটকে আনা হয়েছে এই কারণে যে এই পরিবেশ না হলে নায়ক আর নায়িকা নাটকের পরমুহুর্তটিতে সহজভাবে স্থান করে নিতে পারত না—অন্য পরিবেশের ভিতর দিয়ে টেনে এনে নাটকের এই মুহুর্তটি তৈরি করে তারই মাঝে ছেড়ে দিলে নাটকের ইউনিট নষ্ট হয়ে যেত’’। একাঙ্ক নাটক গুলিতেও দিগিন্দ্রচন্দ্র একইভাবে দেখিয়েছেন শ্রমিক শ্রেণির যন্ত্রনা। প্রতি মুহূর্তে মালিক পক্ষ কিভাবে শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করছে তার চিত্রও আছে।

দিগিন্দ্রচন্দ্রের নাটকে শ্রমিক শ্রেণির আরো নানা রকম বিপর্যয়ের কথা পাওয়া যায়। সেই দীর্ঘ আলোচনা করা এখআনে সম্ভব নয়। তিনি বার বার যে জিনিসটি আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন সেটি হল শ্রমিক শ্রেণির জয় অবশ্যম্ভাবী। একদিন তারা তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছবেই। শ্রমিক শ্রেণির জয়গান গাইতেই তিনি সদা মুখর থাকেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা মতাদর্শ তাদেরকে ঘিরেই। নাটকে তার প্রতিফলন সর্বত্র ঘটে। তিনি যে কথা উল্লেখ করেছেন—‘আমার সমস্ত চিন্তা চেতনার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণির চিত্র উজ্জ্বল। প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্য দিয়ে আমি আমার আইডিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর তাই আমার নাটকগুলিতে শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষের একচ্ছত্র আধিপত্য’।

সূত্রঃ

১। মাক্সিম গোর্কি বা তিক্তপ্রাণ মাক্সিমঃ ‘মা’; প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, অনুবাদ-পুস্পময়ী বসু, ৩য় সংস্করণ।

২। এদুয়ার্দ উতকিনঃ সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ, ট্রেড ইউনিয়ন কী; প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

৩। অসিতকৃষ্ণ দে সম্পাদিতঃ পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন; ট্রেডিউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণি কে ডি ঘোষ।

৪। সুকোমল সেনঃ ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ১৮৩০- ২০০০ এন বি এ সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭।

৫। সজল রায়চৌধুরীঃ নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গণনাট্য মার্চ, ১৯৯০।